ও বালবিধবাদিগকে কুমারী শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদিগের বিবাহের পথ উদ্‌ঘাটন করা বিধেয়। ইহা না হইলে বর্ত্তমান সমাজের স্থিতি, তাহার উন্নতি-সাধন ও অধোগতি নিবারণ অসম্ভব। দেশহিতৈষী নরনারীগণ এ বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যকর কোনও উপায় করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

নানক।

শিখেরা যে ধর্ম্মের শিষ্য, তাহার নাম নানকপন্থী ধর্ম্ম। মহাত্মা নানক সা এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াই ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে।

মহাত্মা নানক খ্রীষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দে কালু নামক ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বিপাসা-নদী-তীরস্থ তালভণ্ডী। পূর্ব্বে এই স্থানটী একটী সামান্য গ্রাম ছিল, কিন্তু এক্ষণে একটী প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছে; ইহার নাম আর তালভণ্ডী নাই, ইহা এক্ষণে রায়পুর নামে প্রসিদ্ধ। নানাধাই নাম্নী নানকের একটী মাত্র ভগিনী ছিলেন। জয়রাম নামক একজন ক্ষত্রিয় যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকালেই নানকের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুরূপ পত্নী লাভ করিয়া তিনি অল্পবয়সেই শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামক দুইটী পুত্র সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নানকের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এই সকল উপাখ্যান কত দূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বহুদর্শিতা ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিবার জন্য মহাত্মা নানক স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে সর্ব্বপ্রথম লাহোর পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগস্থ প্রায় সমুদয় তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। দ্বিতীয় বার যাত্রা করিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতের সমস্ত তীর্থ স্থান ও সিংহল দর্শন করেন। তৃতীয় বার তীর্থযাত্রা করিয়া তিনি আরব ও পারস্য দেশে গমন করেন এবং মক্কা ও মেদিনায় মহম্মদের মস্‌জিদ দর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। দেশভ্রমণের সময় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ মার্দনা এবং সাধু নামক অন্য এক শিষ্য তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। মহাত্মা নানকের পর্য্যটন বিবরণ তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করিয়া যান। দেশ-ভ্রমণের সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় হিন্দু মুসলমান অনেক সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মার সহিত নানকের ধর্ম্মালোচনা ও বিচার বিতর্কাদি হইয়াছিল। এরূপ বিচারে মতদ্বৈধ হইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নানক কখনই

কাহারও সহিত বিবাদ করেন নাই। তিনি স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল ও শান্তিপ্রিয় বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল।

নানক যে কথা অনর্থক ও অহিতকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরে নির্ভর করিতে লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। কোনও সময় একজন যোগী তাঁহাকে স্বীয় শক্তির নিদর্শনস্বরূপ কোনও একটী আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বলেন। মহাত্মা নানক যোগীকে বলেন "আপনার দেখিবার উপযুক্ত কোনও ব্যাপারই আমি দেখাইতে পারিব না। নিজ ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা ভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচারকের আত্মসমর্থন করিবার আর কিছুই নাই। সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা চির-অপরিবর্ত্তনীয়।" নানকের জীবনী-প্রণেতা ভাই গুরুদাস বলেন, এই কথা শুনিয়া যোগী নানকের পদপ্রান্তে নিপতিত হন।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটনের পর নানক আর স্বদেশ পরিত্যাগ করিবেন না সংকল্প করিয়া ইরাবতী নদীতীরে কীর্ত্তিপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য কল্যানোরের রাজা তাঁহার বাসের জন্য এই স্থানে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি সংসারের অভাব অশান্তির আর্ত্তনাদ শুনিতে ভালবাসিতেন না, সুতরাং এই স্থানে নির্জ্জনবাসে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন পরম শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী ও পুত্রেরা কল্যানোরে অবস্থান করিতেন এবং সময়ে সময়ে কীর্ত্তিপুরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

নানকের সাধুতার সুখ্যাতি প্রচারিত হওয়াতে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন। এরূপ কথিত আছে, নানক যখন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তৎকালে শ্রোতৃবর্গ মনে করিত যে, মনুষ্যের এই এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। সপ্ততি বর্ষ বয়সে তিনি জীবন-লীলা সংবরণ করেন। ইরাবতী-তীরে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিস্তম্ভ স্রোতোবেগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তিপুর আজিও পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে—শত সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম-স্থানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু-গণ কীর্ত্তিপুর মঠে নানকের পরিচ্ছদের অংশবিশেষ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। নানক মৃত্যুকালে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিবার ভার আপন পুত্রগণের উপর না দিয়া লেহানা নামক একজন প্রিয় শিষ্যের উপর প্রদান করেন। নানকের মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে অর্জ্জুন-মাল নামক একজন শিষ্যানুশিষ্য নানকের ধর্ম্ম-মত সমুদয় সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করেন। ইহাঁরই নাম গ্রন্থজী বা আদিগ্রন্থ। নানকপন্থীদিগের ইহাই মূল ধর্ম্মগ্রন্থ।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

আমাদের দেশের কি হইল ?

শুধু খেয়ালের জন্যই আমাদের দেশটা অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। দেশের লোকগুলি তবু সেই খেয়ালের উপরেই চলে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি রাজা, কি জমীদার সকলেই আপনাপন মতলবেই আছেন। কেহ কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন না, সমাজকে মানিতে চান না, ধর্ম্মকে ভয় করেন না। ইহার পরে অধঃপতনের আর কি বাকী রহিল ? বিবাহে টাকা লওয়া রোগটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। এ উৎকট রোগের ঔষধ কি ? নিন্দুকের ভয়, ধর্ম্মভয়, এ সবত ইহাঁরা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সরকারী আইন একবার বালিকাবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আর আজ কাল বালক-বিবাহে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইতেছে, তাহা কে দেখে ? আজকালকার বিবাহ-ক্ষেত্রে যাহার পুত্র, তাহারই জগন্নাথ, আর যে বেচারীর কন্যা, সে গরুড়-স্তম্ভের ঝাড়ুদার মাত্র। বিবাহ আসরে উটপক্ষী অপেক্ষাও বরের পিতা উচ্চ-গ্রীব। পুত্রের বিবাহ দিয়া অগাধ টাকা লওয়াই এ পক্ষিরাজের ব্যবসা। পুত্রের বিবাহ নামমাত্র প্রচার করিয়া, অন্যের নিকট হইতে টাকা লওয়াই এ সব নরোত্তম-দের উত্তম কারবার ! পুত্র দুর্ল্লভ বস্তু। লোকে কথায় বলে "দুর্গোৎসব ঘরে ঘরে, পুত্রোৎসব কপালে করে।" এই দুর্ল্লভ বস্তুর বিবাহ ব্যতীত, লোকের মাথার বাড়ি দিয়া এবং বলে, ছলে কৌশলে, অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত, অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় কি নাই ? হায় দুর্ভাগ্য ! এ ব্যাপারে পুত্রের পিতাই পুত্রের ব্যথাদায়ক হইয়া দাঁড়ান। কেননা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি পুত্রের মতামত লন না, প্রেম প্রণয়ের দিকে তাকান না, সুন্দরী অসুন্দরীও বাছেন না, কুলাকুলও দেখেন না, দেখেন কেবল টাকা !

টাকা চাই টাকা, টাকা বৈ, টাকা, টাকা। টাকা দিতে পারিলেই কন্যার বিবাহ হইল, নচেৎ হইল না। টাকার জোরে অন্ধ আতুর কন্যারও রাজার ঘরে বিয়ে হয়। পিতা দরিদ্র হইলে রূপবতী কন্যারও বিবাহ ঘটে না। আহা কি গভীর অনুশোচনা !

টাকা অখণ্ড মণ্ডলাকারে জগতে দিবা-রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুদ্র সাকার মণ্ডলাকার বস্তুটা না করিতে পারে জগতে এমন কুকর্ম্মই নাই। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

একজন ভদ্রলোকের একটি কন্যা ছিল। কন্যাটিও সুন্দরী, ভদ্রলোক নিজেও বেশ ধনশালী। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কন্যার বিবাহে বিলক্ষণ বিলম্ব হইয়া গেল, কারণ বরকর্ত্তার দাওয়া—রূপোর একসেট,

সোণার একসেট্, পিত্তলের একসেট্, কাঁশার একসেট্, তামার একসেট্, কাঁচের এক সেট্ ও পাথরের এক সেট্ বরসজ্জ; পরে গরদের এক ডজন, তসরের এক ডজন, সাটিনের এক ডজন, ক্রেপের এক ডজন ইত্যাদি পরিচ্ছদের ফর্দ্দ। এই ডজনের ভয়ে, সেটের ভয়ে কন্যাকর্ত্তাকে ছুটিয়া পলাইতে হইল। কারণ তাঁহার তহবিলে এত ধন জমা ছিল না। অবশেষে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কন্যার বিবাহ স্থির হইল। ভদ্রলোক যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলেন। কল্য বিবাহ, অদ্য তাঁহার গৃহে গ্রামিক লোকের নিমন্ত্রণ। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানায় গৃহ পূর্ণ। কিন্তু যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া পরে অভুক্ত অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। দুঃখে ক্ষোভে কাহারো আহার হইল না, কারণ ভদ্রলোকের ভাবী বৈবাহিক অধিক টাকার লোভে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ কাটিয়া দিয়া পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিতেছেন। ভদ্র লোক সস্ত্রীক কন্যার গলা ধরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল অশ্রুমুখে সে গৃহ ত্যাগ করিল। আর সে মন্দভাগিনী কন্যার দশা কি হইল, কে দেখে, কে ভাবে? তাই বলিতেছি টাকায় না করিতে পারে, এমন কিছুই নাই।

আহা! প্রতিবেশীদের যে দয়া হইল, ভাবী বৈবাহিকের সে দয়া হইল না, কি জন্য? না তিনি পুত্রের বাপ। আজ কাল পুত্রের পিতারা এই ব্যবসাই আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ শুনন। পুত্রের পিতা আপন মনোগত ভাব সভাস্থলে ব্যক্ত করিতেছেন —"আমি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বশান্ত হইয়াছি, এবারে পুত্রের বিবাহ দিয়া যাহার কন্যা ঘরে আনিব, তাহাকে সর্ব্ব-শান্ত করিব। হো-হো—উচ্চ হাস্য।" হা ধিক্, হা ধিক্, শেষে কি আমাদের দেশের এই গতি হইল?

ছেলের বাপ ঐ আবার কি বলিতেছেন শোনা যাক। ছেলের বাপ বলিতেছেন "ছেলের বিবাহ দিয়ে টাকা লওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না, তবে কিনা গতবারে পূর্ব্ব বাড়ীর মোকদ্দমাটায় ৪০০০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্যই কনের পিতার নিকট হইতে নগদ ৪০০০ হাজার টাকা লইতে হইল। গৃহিণী পুত্র প্রসব করিয়া আমার বড়ই উপকার করিয়াছেন। এ উপকারের জন্য আমি বাস্তবিকই তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। হো হো হো হাস্য, হা হা উচ্চ হাস্য।"

পূর্ব্বে ছিল মেয়ের বিবাহে টাকা লাগিত না, যে যাহা পারিত দিয়া অষ্টম বৎসরে মেয়েকে গৌরী দান করিয়া স্বর্গলাভের ফল সঞ্চয় করিত এবং পিতার পুণ্য-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মেয়েরও রসাতল-গমন অথবা বৈধব্য যন্ত্রণার পথ মুক্ত হইত। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। কনের পিতা ডজন ও সেটের ভয়ে বরের পিতার নিকট অগ্রসর হইতে পারেন

না, অতএব কনের বয়স ১৫।১৬র সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে। এদিকে আবার বরের পিতা উৎকণ্ঠার সহিত ১৪ বৎসর অপেক্ষা করেন। পুত্রটি যেই ১৫ বৎসরে পদার্পণ করে, সেই তাহার বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাক্রমে বালিকা-বিবাহ বন্ধ করিয়া মহা অনিষ্টকর বালক-বিবাহ দেশে প্রবল হইল। পিতা ধনলোভে বাল্যসীমা অতিক্রম না করিতে করিতেই পুত্রের বিবাহ দেন। এ দিকে প্রচুর ধনাভাবে কন্যার পিতা উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। কন্যা কুমারী অবস্থাতেই যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, পরে সেই বয়ঃস্থা কনের সঙ্গে বালক-বরের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফল ভবিষ্যতে অতি বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। অতএব স্বামীর তখন গৃহবিমুখ ও দুর্নীতি-পর হওয়া বিচিত্র নহে। এদিকে স্ত্রী যথেষ্ট সন্তান সন্ততি লইয়া অন্তঃপুর অশ্রুজলে সিক্ত করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ১৫।১৬।১৭।১৮ বৎসরের কিশোর বালকদের সন্তান-সন্ততিও দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতে দেখা যায়। এ সমস্ত অনিষ্টই এক বরের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃক সাধিত হয়। তাঁহারা যদি এই "পুত্রের বিয়ের টাকা লওয়া" নামক ঘৃণিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবে কনের পিতাও পরিমিতবয়স্কা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হন (এবং আমার বিশ্বাস, এই ঘৃণাকর ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে পিতারও বালকবিবাহ দিবার ইচ্ছা নেহাত বলবতী হইবে না); বালকেরাও পত্নী-গলগ্রহরূপ ব্যাধি হইতে পরিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে; বর কনেরও উপযুক্ত বয়সে মিলন হইবে এবং সর্ব্বদিক্ বজায় থাকিবে।

শ্রীঅম্বুজা—

দশা কি হলো?

হায়! দেশের কি দশা হলো?
　কনে হল বছর কুড়ি,
　বরে চায় গাড়ি ঘুড়ী,
আরো কত নগদ নগদ,
শুনে সবার প্রাণ শুকালো;
হায় দেশের কি দশা হলো?
হায় দেশের কি দশা হলো!
　বড় চালাক বরের পিতা,
　মোচে তা দিয়ে কয় কথা,
টেঁকো মাথায় হাত বুলায়ে—
"কত দিবে" বল বল।
"ওহে কনের পিতা কত দিবে বল বল?"
হায়! দেশের কি দশা হলো?
　কনের পিতাকে হাতে পেলে
　বরের পিতা বেঁধে হালে,
মাঠে মাঠে ঘুরায় ফিরায়,
সবে বলে বলদ ভাল।
হায় দেশের কি দশা হলো?

হিন্দু মরে কন্যা-দায়ে,
পুত্রের পিতা দেখে চেয়ে,
হাঁড়ির মত মুখ ফুলায়ে,—
হায়! ধর্ম্ম রসাতলে গেল!
হায় দেশের কি দশা হলো?
বরের ধনুর্ভঙ্গ পণ,
শুনে কাঁপে ত্রিভুবন—
নগদ নিব হাজার হাজার—
গহনার ফর্দ্দিত পিছে রৈল।
হায় দেশের কি দশা হলো?
হীরা মোহর স্বর্ণ রৌপ্য
রীতিমত মেপে নিব,
খাট আল্‌না অল্প কথা,
শাল বনাত আগে এনে ফেলো;
হায়! দেশের কি দশা হলো?
ডেস্ক বাক্স আর চেন ঘড়ি
পেন আর পেনকাটা ছুরী,
শ্বেত পাথরের আল্‌না চকী,
আয়না ব্রুষটী অতি ভাল।
দেশের গতি হায় কি হলো?
পুত্রের বিয়ে দিয়ে হায়!
পিতা রাজা হতে চায়,
গতিক মন্দ দেখে ধবক্,
কনের পিতার প্রাণ শুকালো।
হায়! দেশের কি দশা হলো!!

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

বিবি বেসাণ্টের বক্তৃতা।

বিগত ২৭শে নবেম্বর শাহারণপুরের স্থানীয় সুযোগ্য মুনসরিম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসাদ সান্যালের যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীমতী আনি বেসাণ্টের শুভাগমন হয়। অত্রত্য টাউনহলে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের জন্য নিম্নে বিবৃত করিলাম, তাঁহারা এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, এখনকার পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষা দান করিতে হইলে কি কি ব্যবহারের প্রয়োজন। তিনি বলেন—

"আজ কাল সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতেছে, ইহার কারণ কি? ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্রদায় লুপ্ত বিষয় সকল উদ্ধার করিতেছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটীর মূলে কতিপয় পাশ্চাত্য মনস্বীর যোগদান। তাহা হইতেই এই থিয়সফিকাল সোসাইটির সৃষ্টি। সোসাইটীর গবেষণা-ফলদ্বারা হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের উদ্ধার হইতেছে। সোসাইটী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সাহায্য করিতে গিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মূলে গিয়া পড়িয়াছেন এবং সেই নিমিত্ত তাহাকে কুসংস্কার (superstition) মানিতে হইতেছে। অনেকে বলিবেন, কুসংস্কার মানা আবার কি? কিন্তু তাহা না মানিলে চলিবে না। (তিনি বলেন) যখন ধর্ম্মভীরুতা লোকের মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পায়,

তখন তাহারা জীবনের সকল কার্য্যকেই ধর্ম্মের সহিত গাঁথিয়া ফেলে এবং তাহাদের জীবনের কোন একটি কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলেই তাহারা বলে এটা অধর্ম্ম হইল। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞানের সন্ধিস্থলে যে একটি ভাব নিহিত রহিয়াছে, সেইটকে ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া তাহার উপর যথার্থ ধর্ম্মের সোপান গাঁথিয়া লইতে হইবে। সেই নিমিত্ত ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রথম প্রথম সুপারষ্টিসন (superstition) থাকিবেই থাকিবে। সোসাইটিকে সেই জন্য সুপারষ্টিসন্ মানিতে হইয়াছে।*

এককালে যখন হিন্দুদের ধর্ম্মবল ছিল, তখন হিন্দুরা সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতি ধর্ম্মকে আপনার সকল কর্ম্মের সহিত মিশাইয়া লইয়াছিল। তখন উঁহারা জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, বলবান্, কীর্ত্তিমান্, বীর্য্যবান্, শৌর্য্যবান্ ছিলেন। যখন হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তখন বাহুতে বল, গৃহে লক্ষ্মী ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্তি ছিল। পরে যখন ক্রমশঃ হিন্দুর ধর্ম্মবল দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই তাহাদের বল, বীর্য্য, মেধা একে একে লোপ পাইতে আরম্ভ হইল। বলবান্ হিন্দুর বাহুতে বল নাই, গৃহে লক্ষ্মী নাই, ভূমিতে শস্য আর তেমন উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে মেধাবী ও প্রতিভাশালী হিন্দুজাতির মস্তিষ্ক হইতে সাঙ্খ্য, বেদ বেদান্ত, দর্শন বিজ্ঞান বাহির হইয়াছে; এখন আর সেরূপ একটীও বাহির হয় না। আসল (Original) পুস্তক আর প্রকাশিত হয় না। প্রতিভা যত দিন দিন কমিতে লাগিল, ততই আসল পুস্তক লেখা বন্ধ হইল, এবং আসল যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কেবল 'টীকা' বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু আজ কাল আর সেরূপ 'টীকা'ও প্রকাশিত হয় না।

ভারতবর্ষে আজিকালি দুই প্রকার লোক দেখা যায়—এক আগেকার কালের পণ্ডিত—ইঁহারা ইংরাজি জানেন না, সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অতি সুন্দররূপে অবগত আছেন; আর এক এখনকার নব্য শিক্ষিত কলেজের ছাত্রগণ—তাঁহারা কেবল দুই চারি পাতা ফিলসফি পড়িয়াছেন, অথচ সংস্কৃত শিক্ষা আদৌ হইতেছে না; ইঁহাদের দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উন্নতি হইবার আশা নাই। আজকাল নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়গণ নিজের ধর্ম্ম হারাইয়া, সামান্য দুই চারিটি ইংরাজি কথা কহিতে শিখিয়া এবং দুই চারি পাতা হার্বাট স্পেনসার, মিল, হেগেল, ক্যাণ্ট পড়িয়া আপনার সেই ধর্ম্মটিকে—যাহা তাঁহাদিগকে একদিন জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল—ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং তাঁহাদিগের ভ্রম এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, যদ্যপি কেহ তাহাদিগকে সেই ধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সে বিষয়টি তলাইয়া না বুঝিয়া হাসিয়া

* মিসেস বেসান্টের সরলতা প্রশংসার্হ। তবে কুসংস্কার সর্ব্বতঃ পরিত্যাজ্য। বা, বো, স।

উড়াইয়া দেন। কিন্তু থিয়সফিক্যাল সোসাইটি এই ভ্রমের আবরণ তাহাদিগের চক্ষু হইতে উঠাইয়া দিতেছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি তাঁহাদিগে ধর্ম্মের কুটজাল সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সুন্দররূপে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝাইয়া দিতেছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কাজ বুঝাইয়া দেওয়া। তুমি হিন্দু, তুমি নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখ, নিজ-নীতিপূর্ণ শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম সকল সুন্দররূপে বুঝিয়া তাহার উপর জীবনের পরিচালনা কর। পৃথিবীর সকল জাতিকে হিন্দু করা থিয়সফিক্যাল সোসাইটির উদ্দেশ্য নয়। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি এতকাল পরে বুঝিয়াছে যে, হিন্দুজাতির ধর্ম্ম যথার্থরূপে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে প্রাচীনগণকে শিখাইলে হইবে না, এখন হিন্দুজাতির বালকগণকে শিখান আবশ্যক; এবং তাহাদিগের বিভায় স্তম্ভ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের শিক্ষাদি কিরূপে দেওয়া হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

অতিদূর দেশ দেশান্তর হইতে বালকগণ আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য অতি সুন্দর বোর্ডিং হাউস আছে। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার দেশহিতৈষী সম্ভ্রান্ত বাবু ভগবান দাস নিজের সকল কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া বোর্ডিংয়ের বালকদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি বিনা বেতনে এই সকল কর্ম্ম করেন।

প্রথম—বালকগণ প্রাতে উঠিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করে। যতদূর সম্ভব এই বোর্ডিংয়ে অবিবাহিত ছাত্রগণকে রাখা হয়, এবং নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র নিম্নশ্রেণীতে পঠদ্দশায় থাকিয়া বিবাহ করিবে, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। এক কথায় বাল্যবিবাহ নিবারণ ও পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন ইহার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়—বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার অনেক আছে। এই বাল্যবিবাহই হিন্দুজাতির অবনতির এক প্রধান কারণ। হিন্দুজাতি ধর্ম্মকে যখন ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়াছিল, তখনকার তাহাদিগের দৈহিক ক্ষমতার বিষয় তাহাদিগের পুস্তকাদিতে পাঠ করিলে এবং এখনকার রুগ্ন, শুষ্ক, জরাজীর্ণ বালকবালিকাদিগের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিলে মনে হয় হিন্দুজাতির কি অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজ পৃথিবীতে যত জাতি, তাহাদের মধ্যে হিন্দুজাতির বালকবালিকাগণ যেমন দুর্ব্বল, এমন আর কোন জাতিরই নহে। তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা থাকিলেও তাহার অতি অল্পই প্রকাশ পায়। এই বাল্যবিবাহই তাহাদের উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

তৃতীয়—ব্যায়াম। হিন্দুসন্তানগণের যাহাতে বল বীর্য্য বাড়ে, অঙ্গসৌষ্ঠবাদি

সুন্দররূপে পরিপুষ্টতা লাভ করে, তাহার নিমিত্ত ব্যায়ামের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। বোর্ডিংয়ের বালকদিগকে সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের শিক্ষকের সহিত ব্যায়াম করিতে হয়।

চতুর্থ—স্কুলের প্রাত্যহিক পাঠাদি আরম্ভের পূর্ব্বে বেদাদি পাঠ হয়, এবং নীতিশিক্ষার জন্য পুরাতন গ্রন্থ ও ধর্ম্ম-পুস্তকাদি—রামায়ণ, মহাভারত—হইতে তাহাদের সুন্দর সুন্দর চিত্র সকল শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন, যদি কোন ছেলেকে বলা হয় "তোমরা পিতা মাতার বাধ্য হইবে, তাঁহাদের কথা শুনিবে," তাহা হইলে সে বলিবে "ইহাত মুখের কথা"। এইরূপ নীতিশিক্ষায় কোন ফল হয় না। যদি সেই বালকের সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ নীতি-চরিত্র ধরা যায়, এবং বলা যায় যে, তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনগমন করিয়াছিলেন ও কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তখন সে বালক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ কি করা উচিত, ইহা মুখের কথা নহে। ইংরাজ বালকগণের সম্মুখে নেল্‌সনের নাম করিলে এবং তাহার বীরত্বের কাহিনী শুনাইলে তাহাদের ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু এ দেশে নেল্‌সনের কথা বালকগণকে আগাগোড়া পড়াইলেও তাহারা সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব এই বালকদিগকে পুরাকালের মহৎ চরিত্র শুনাইলে তাহাদের যত উপকার হইবে, নেল্‌সনের জীবনী আগাগোড়া পড়াইলেও তাহার ফল কিছুই হইবে না।

পঞ্চম—মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তি গঠন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে যদি একটি বালকও সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে শিখে, তাহাহইলে পৃথিবীতে সে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারিবে।

হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য ছাত্রগণকে হিন্দু আদর্শে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া। কলেজে তিনটি ইউরোপীয় প্রোফেসর আছেন। ইঁহারা কেহই বেতনভোগী নহেন।

ডাক্তার রিচার্ডসনের নাম বোধ করি আজকালকার বৈজ্ঞানিক জগৎ ভালরূপই জানেন। তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন। এ বৎসর এ দেশের ছোটলাট বাহাদুর হিন্দু কলেজ পরিদর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার 'লেবরেটরি' দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ডাক্তার রিচার্ডসনকে জিজ্ঞাসা করেন, এই সকল যন্ত্রের মূল্য কত? ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন "বালকদিগের দশটি অঙ্গুলি"।

ভারতবর্ষে সকল প্রকার ধর্ম্মের লোকই আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, পার্শি, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, সকলি আছে। যদি তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম লইয়া বাদানুবাদ করে, তাহা হইলে রাজ্য-বিপ্লব ঘটে।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটি (religion

of tolerance) ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা শিক্ষা দেয়। থিয়সফিক্যাল সোসাইটী সকলকে স্ব-দলভুক্ত ও ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিতেছে যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। যাহার যাহা ধর্ম্ম আছে, সে তাহাই করুক। পথ যদিও পৃথক্, কিন্তু উদ্দেশ্য এক, এবং শেষ-কালে আমরা যেখানে পঁহুছিব, তাহাও এক। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ কেবল এ সংসারেই হয়, স্বর্গে তাহা হয় না। আমরা এ পৃথিবীতে যে দেবতার উপাসনা করি, এবং নিজ নিজ যে দেবতা লইয়া অপরের সহিত বাদানুবাদ করি, সেই সেই দেবতা-গণ কিন্তু স্বর্গে কখনও আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ করেন না। আমরা সকলেই সত্যের অনুসরণ করিতেছি, সত্য এক বিন্দুর মত মধ্যস্থলে স্থাপিত, আমরা তাহার চতুপার্শ্ব হইতে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে দিক্ দিয়াই হউক না কেন যখন তাহার দিকে ধাবিত হই, তখন দেখিতে পাই যে, আমরা শেষে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার আপনার লক্ষ্য স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

শ্রীশশিমুখী দেবী।

মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা।

মৃত্যু শব্দটী বড়ই ভয়ানক। মানব-মাত্রেই ইহাতে ভীত ও স্তম্ভিত! কিন্তু মৃত্যু কি? মরে কে? এইমাত্র যে মানব চলিতেছিল, বলিতেছিল, কত কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ সে রোগগ্রস্ত হইল। দারুণ যন্ত্রণা ভুগিয়া অকস্মাৎ প্রাণ হারাইল। তাহার সব ফুরাইল। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ সেইরূপ অটুট রহিল, কিন্তু অসাড়—মৃত! আর নয়নে দৃষ্টি নাই, মুখে হাসি নাই, শরীরে শক্তি নাই; জিহ্বায় কথা বা হৃদয়ে স্পন্দন নাই। সব নিশ্চল! নিশ্চেষ্ট! জড়! অথচ দেহীর দেহের সবই আছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া নাই। শোকাতুরা জননীর হাহাকার, স্ত্রীর কাতরতা, সন্তানের করুণ রোদন, এ সব কিছুই তাহার কর্ণে বা অন্তরে প্রবেশ করে না। এখন সে আত্মা মায়া মোহের অতীত হইয়া অদৃশ্য কোন্ দূরতর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কে জানে?

মৃত্যুর পর জড় দেহ পড়িয়া থাকে, অথচ তাহাতে কিছুই থাকে না। এ দেহ সে নয়! দেহ পঞ্চ ভূতের সমষ্টিমাত্র। এই ভৌতিক দেহ পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া যায়। জড় দেহকে যে চালাইয়াছিল, সে চৈতন্য কোথায় বিলুপ্ত হয়? এই চৈতন্যের তিরোধানই মৃত্যু! কত মানব এখনি এ জগত ছাড়িতে হইবে, তাহা বুঝে না, জানে না; এবং মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্রই প্রস্তুত থাকে না। অতি অতর্কিত ভাবে মানবের নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার যত্নের দেহ অবশ করিয়া চৈতন্য অলক্ষিত ভাবে কোথায় চলিয়া যায়! তাই ভাবিতে-

ছিলাম মৃত্যু কি? চৈতন্ত অবিনাশী, নিত্য, সত্য, শুদ্ধ। যে মৃত্যুর নামে আমরা ভীত ও কম্পিত, তাহা স্বধু দেহত্যাগ বই আর কিছুই নহে। যেমন কাপড় পুরাতন হইলে বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ রক্তমাংসগঠিত দেহ জীবাত্মার বাসের অযোগ্য হইলেই আত্মা স্থানান্তরে গমন করে। ইহাই মৃত্যুনামে সংসারে পরিচিত। সবল সুস্থ দেহও মানবাত্মা ত্যাগ করে, সুতরাং দেহত্যাগ বা মৃত্যুর কর্তা দেহও নয়, দেহীও নয়। মৃত্যু নিত্য সত্য চিন্ময় ভগবানেরই লীলা। তাঁহারই ইঙ্গিতে মানব এ মমতাপূর্ণ সংসার হইতে চলিয়া যায়।

আহা! মানবজীবন কত স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় লইয়া, কত উৎসাহ আশা বাসনা লইয়া সংসারে খাটিতেছিল, কে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল? কতকগুলি শক্তি বৃত্তি লইয়া মানব এ জগতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যেই তাহার কার্য্য শেষ হইল, অমনি মানবের আসা যাওয়ার কর্তা যিনি, সময় বুঝিয়া ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু মানবের কার্য্য শেষ হইল, কি অপূর্ণ রহিল, মানব তাহা বুঝিল না। সেই সচেতন নির্ব্বাক্ ইঙ্গিত মানব উপলব্ধি করিতে পারে না, অথচ যন্ত্রারূঢ় যন্ত্রের স্থায়, বাজীকরের পুতুলের ন্তায় অবশ ভাবে চলিয়া যায়। কেন আসে, কেন যায়, আমরা বুঝিতে পারি না।

এ সংসার পান্থনিবাস। এখানে আমরা সকলেই পথিক। আমাদের কর্ত্তা চিরমঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাই আমরা আসিয়াছি। আবার যখন ডাকিয়া লইবেন, চলিয়া যাইব। তাঁহার স্নেহাকর্ষণ সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি রহিয়াছে। তিনি কেন যে কি করেন, আমাদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। ঈশ্বর যাহাকে যতটুকু শক্তি ও কার্য্যের পরিসর দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, সে ততটুকু করে। যখন তাহা শেষ হয়, তখনই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তাহাকে ডাকিয়া লন। আমরা তাহা বুঝি না; তাই কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, সময় অসময়, বালক বৃদ্ধাদি ভাবিয়া নানা ভাবে আকুল হই। কিন্তু মানবের চৈতন্ত যিনি, তিনি সর্ব্বদাই বালক যুবক বৃদ্ধ। তিনি নিত্য, সমভাবে নবীন প্রবীণ। তিনি কাহাকেও অসময়ে লন না। যাহাকে যে কয় দিবসের জন্ত পাঠাইয়াছেন, সে তত দিন মাত্র থাকে।

এ সংসার পান্থনিবাস, এখানে আমরা সকলেই পথিক। এ স্থান আমাদের চির দিনের নয়। আমরা পূর্ব্বেও এখানে ছিলাম না, পরেও থাকিব না। এই সংসার হইতে যাহারা গিয়াছে, তাহারাও আমাদের জন্ত অপেক্ষা করে নাই বা আমাদিগকে সঙ্গেও লয় নাই। আমরাও যখন যাইব, কাহারও জন্ত অপেক্ষা করিব না বা কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যে যতই কেন প্রিয় হউক না, তাহার সঙ্গে কেবল পথের পরিচয়। এ সংসারের

ভালবাসা কেবল অনিত্য বাসনাময় মোহের বন্ধন। এই সুঠাম সবল দেহ, ইহার পরিণতি ভস্মাঙ্গার! এই শোক, দুঃখ, সুখ, শান্তি, হর্ষ, বিষাদ, সমুদায় কিছুকালের জন্য মাত্র। আমাদের সঙ্গে এ সব কিছুই যাইবে না। এখনকার এই আলো তেজ জল বায়ু আদির সঙ্গেও আমাদের ভৌতিক দেহের সম্বন্ধ মাত্র। এই দেহ পরিণামে পঞ্চে পঞ্চ মিশিয়া যাইবে। এই ভূতময় জগতের সংযোগ বিয়োগ পর্য্যায় দেখা যায়। এই মাটীর দেহ মাটি হইয়া শস্যাদিতে পরিণত হইয়া জীবদেহের পুষ্টি-সাধন করতঃ প্রকারান্তরে পুনরায় দেহ-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু এ নশ্বর বস্তু মানবাত্মার সঙ্গে যাইবে না। চিরদিন একভাবেও থাকিবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে সর্ব্বদাই ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি, নূতন, পুরাতন প্রভৃতি নানারূপ পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। চিরস্থির মানবচৈতন্য সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। এ মর জগতের ক্ষণস্থায়ী কোনও বস্তুর সহিতই তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

মৃত্যুই সর্ব্বদা আমাদিগকে এ শিক্ষা দিতেছে যে, এ সংসার অসার! তথাপি আমরা মোহান্ধ হইয়া "আমি," "আমার" ভাবিয়া অস্থির হইতেছি। আমার পিতা, মাতা, ভাই, বোন, পতি, সন্তান, আমার মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, আমার বাড়ী ঘর, সম্পত্তি বলিয়া কতই না দম্ভ করিয়া থাকি। একবারও ভাবিয়া দেখি না আমার কি? প্রতিমুহূর্ত্তে এই দেহ ও জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, জীবন অসার করিয়া, হৃদয় চূর্ণ করিয়া, জগৎ অন্ধকার করিয়া জীবনের অতি প্রিয় জিনিসগুলি চলিয়া যাইতেছে। মৃত্যু হাতে কলমে সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া দিতেছে। তথাপি আমরা এমনি ভ্রমান্ধ ও জ্ঞানহীন যে, গুরু আঘাতে ভগ্নহৃদয়ে, আবার সেই "আমার" লইয়াই ব্যস্ত। এমন কি আরও পাঁচটা আমার কল্পনা করিয়া অসার চিন্তায় মগ্ন হই। শুভময় জগৎস্বামী মৃত্যুদ্বারা পুনঃপুনঃ আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, "এ সংসার কিছু নয়! সব অনিত্য অসার!" আরও বলিতেছেন, "এ অসার সুখকল্পনা ত্যাগ করিয়া সত্যপথ অন্বেষণ কর।" আমরা মোহান্ধ মানব অসত্যকে সত্য জানিয়া, প্রকৃত সত্য উপেক্ষা করিয়া বৃথা সুখ-কল্পনায় ও শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া দিন দিন অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি। হায়! আমাদের দুর্গতির কি শেষ আছে? মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া আমরা শূন্যে গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে চাই। যদি আমরা স্থির-ভাবে একটু আপনার দিকে তাকাই, তবে আর মন অসার সুখ-কামনায় প্রমত্ত হয় না, সুতরাং শোক দুঃখেও এরূপ অভিভূত হইতে হয় না। আমরা বৃথা সুখ-কামনায় প্রলুব্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতেছি। এই জন্য প্রতিপদক্ষেপেই পতিত হইতেছি এবং আঘাতে, আঘাতে হৃদয় চূর্ণ হইয়া জীবনকে বড়ই সন্তপ্ত ও দুর্ব্বল করিতেছে। মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, এই সংসাররূপ পান্থনিবাসে

আমরা কয়েক দিবসের জন্য আসিয়াছি। কে জানে, কখন কাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার। যত দিন আমি এ জগতে আছি, ততদিন আমার জগৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে। যে মানব যত দিন এ স্থানে আছে, তত দিন আমার তাহারও প্রতি কর্ত্তব্য আছে। আজ যাহার কাল হইবে, কাল আমরা তাহার কি করিতে পারি? কাল আর তাহার প্রতি কাহারও কোন কর্ত্তব্যই থাকে না। আমাদের চিত্ত তৃপ্তির জন্য, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অনেক কান্না কাটি করিতে পারি, সমারোহপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি বা দান করিতে পারি, মৃত ব্যক্তির স্মৃতির জন্য যথেষ্ট শ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে মৃত ব্যক্তির কোন অভাবেরই পূরণ হয় না, অথবা ইহাতে তাহার কোন তৃপ্তি নাই। যে যত দিন সংসারে আছে, তত দিন তাহাকে সদ্ব্যবহারে সন্তোষে রাখিতে পারিলে, কোন প্রকারে তাহার ক্লেশের কাজ না করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে সর্ব্বদা সমাহিত ও সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে, তবেই উভয় দিকে কিছু তৃপ্তি ও শান্তির আশা থাকে।

কিন্তু আমরা বড়ই মোহমুগ্ধ। সর্ব্বদা মৃত্যুর সহিত পরিচিত হইয়াও আমরা যেন সকলেই অমর এই ভাবে সর্ব্বদা ইচ্ছামত কর্ত্তব্য নিরূপিত করিয়া কার্য্য করিতেছি, একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, পরে ইহার জন্য আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে। বিধাতারই কি এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে, আমরা সময় থাকিতে কিছু বুঝি না। যখনকার যাহা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত মত করা যায়, তবে দুঃখময় সংসারে কতক শান্তির আশা থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সময় অতীত না হইলে আমাদের সময়োচিত জ্ঞান জন্মে না। যখন যাহার অভাব হয়, তখনই তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি। তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হই। তখন আর তাহার প্রতীকারের কোনও উপায়ই থাকে না। হায়! যদি সর্ব্বদা সকলের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিতাম, সকলের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি না করিতাম, তবে এ শোকার্ত্ত হৃদয়ে কতক শান্তির আশা থাকিত। এখন যে দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, তাহার কোনও প্রতীকার নাই।

মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে বলিতেছে, "এ সংসারে সকলেই অতিথি। অতিথি অবহেলায় চলিয়া না যাইতে যাইতে তাহার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর।" গৃহে কোনও অতিথি উপস্থিত থাকিলে অতিথির সকল অভাব কায়মনোবাক্যে পূরণ করিতে পারিলে গৃহস্থের হৃদয়ে অতুল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই সংসার-গৃহে প্রত্যেকেই অতিথি। যদি প্রত্যেকেই অতিথি, যদি প্রত্যেকের প্রতি

যথোপযুক্ত, ব্যবহারের ত্রুটি না হয়, তবে নানা প্রকার শোক দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইলেও কতকটা প্রবোধ বা শান্তির আশা থাকে। কিন্তু কয়টী মানব মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারেন যে "আমার জীবনে কোনও গত বিষয়েরই জন্য অনুতাপ নাই এবং আমি আমার জীবনের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি।" হায়! আমাদের প্রতিপাদক্ষেপেই ভুল ত্রুটি আমাদিগকে জড়াইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণে এই প্রশ্নের উদয় করিতেছে যে, "মৃত ব্যক্তি সুখে থাকে ত?" কত লোক মৃত্যুসময় দুঃখব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে ও অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া যায়। আহা! দেহত্যাগের পর কি আর তাহাদের এ মর জগতের প্রতি কোনও মমতা থাকে? মরিতেছি ইহাও ত কত লোক বুঝে না? আহা! তাহারা জগৎ ছাড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া জগতের স্নেহ মমতার জন্য কি কাতর হয়? না তাহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ইহকালের সমুদায় বিস্মৃত হইয়া চিরশান্তি লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যদি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইত, তবে অনেক শোকদগ্ধ প্রাণের সান্ত্বনার বিষয় থাকিত। কিন্তু ভগবান্ সে পথ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়াছেন। সকলই তাঁহার শুভ ইচ্ছার শুভ বিধান। তিনিই আমাদের প্রবোধ ও শান্তির আশ্রয়।

আমরা যদি শান্তির আশ্রয় ও নিত্য ধন চিনিয়া লইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করি, তবে সম্ভবত সফলকাম হইয়া প্রাণের হাহাকার দূর করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে আর মৃত্যুকে অত নির্দ্দয় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইবে না, বরং পরমহিতকারী সুহৃদ্ বিবেচনায় তাহাকে সুখে আলিঙ্গন করিতে পারিব। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু কখনও ভয়জনক বা নির্দ্দয় ও দুঃখজনক নয়। মৃত্যু পরম-কারুণিক পিতার শুভ হস্তের করুণা-প্রসাদ। একমাত্র মৃত্যুই আমাদের মোহনিদ্রায় নিদ্রিত জীবনকে জাগ্রত করিতে সক্ষম। একমাত্র মৃত্যুই অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া চির-সত্য অনন্তের পানে আকর্ষণ করিতেছে।

তাই বলি, আমার চিরসুহৃদ্ মৃত্যু! তুমি আমাকে শৈশবকালাবধি নিষ্পেষিত করিয়া বলিতেছ, "অসার সংসার", কিন্তু আমি এমনি মোহান্ধ যে, তাহাতেও সংসারের অসারত্ব বুঝিয়াও বুঝি নাই। একটি হারাইয়া অপরটিতে অধিকতর জড়াইয়া পড়িতেছি, এবং নির্দ্দয় মৃত্যু আমার কোন্টী কাড়িয়া লইবে? সর্ব্বদা এই ভয়ে ভীত হইতেছি। মৃত্যু! তুমি করুণাময় শ্রীহরির শুভ হস্তের শুভ নিদর্শন, মানবজীবনের মঙ্গলের নিমিত্তই ওরূপ মর্ম্মাঘাতীরূপে জগতে আগমন করিয়া মানবগণের হিতসাধন করিতেছ। আমরা বুঝি না, তাই তোমার আগমনে ভীত শোকার্ত্ত হইয়া হাহাকার করি।

আমরা অত্যন্ত ভ্রমান্ধ, তাই তোমার শান্তিময় প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই না. তাহার পরিবর্ত্তে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিতে শিহরিয়া উঠি। আমার চিরসুহৃদ্ মৃত্যু! তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে, ভবিষ্যতে যখন তুমি আগমন করিবে, আমি যেন তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে পারি। তোমার কার্য্যে অধীর না হইয়া সমাহিতচিত্তে শুভনিয়ন্তার ধ্যানে মগ্ন হইতে পারি। তুমি যখন আমাকে আহ্বান করিবে, আমি যেন অবিকৃতচিত্তে সুধাময় শ্রীহরির চরণ স্মরণ করিতে করিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারি।

ইহা পাঠে যদি কোনও শোকার্ত্তহৃদয় পাঠিকা বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি বোধ করেন, তবেই আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আশু ভ্রাতা ও সন্তান-হারা
জনৈক বিধবা।

নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য।

আজকাল অনেকের মুখে নব্য ভৃত্য ও ঝির নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় তাদের আর কাজে আঠা নাই, প্রভু প্রভুপত্নী বা তাঁদের সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি আর টান নাই, প্রভুশক্তিকে আর তত ভয় করে না। কথাটা যে একবারে ভিত্তিশূন্য, তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ আজকাল-কার ভৃত্য একরূপ নূতন জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় সে কাজে ফাঁকি দিতে চায়, টাকার প্রতি অথবা লাভের প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখায়, আহারাদি ভাল না হইলে রাগ করে, দুই একখানা বেশী কাজ করিতে হইলে বিরক্তি প্রকাশ করে, প্রায়ই চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়,—এক কথায় "পানেতে চূণ খসিলে" অনর্থ ঘটাইয়া তুলে। যাঁহাদের চাকর বাকর না রাখিলে চলে না, তাঁহাদিগকে অনেক সময় তাহাদের উৎপাতে তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। উপদ্রবটা সহরে কিছু বেশী। লোক-জনের দরকার পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে অনেক অধিক, চাকরি যাইলে সেখানে শীঘ্র নূতন চাকরি জুটাইয়া লওয়া যায়। পল্লীগ্রামে অনেক সময় চাকর মেলেই না, যদি মেলে তাহারা তত মুখর বা অল্পে অসন্তুষ্ট নয়।

একটা কথা উঠিতে পারে—ঝি চাকরের ত দোষ অনেক, কিন্তু নব্য মুনিব বা মুনিবানীর কি কোনও দোষ নাই? সেকালের প্রভু বা প্রভুপত্নী লোকজনকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ করিতেন, একালের তাঁরা কি সেইরূপ করেন? এ প্রশ্নে কেহ কেহ বিরক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা

ভাবেন চাকর মাহিনা খায়, আহার পায়, প্রভুর কাজ তার প্রাণপণে আনন্দের সহিত করা কর্ত্তব্য; যদি সে না করে, তার 'নিমকহারামী' হয়। প্রভু তাহাকে মাহিনা দেন, আহার দেন, আর সে তাঁর নিকট হইতে কি বেশী প্রত্যাশা করিতে পারে? তাঁর আর তার প্রতি অন্য কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? গলদ কিন্তু এইখানেই। প্রভু যদি মনে করিতে পারেন চাকরকে আহার ও মাহিনা দিলেই তার প্রতি তাঁর সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইল, তবে সামান্য নিরক্ষর ভৃত্যের ইহা মনে করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে যাহা পায়, তার উপযুক্ত কাজ সে করে এবং তাহা করিলেই তার কর্ত্তব্যের (যদি তার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে) শেষ হইল?

কথা হইতেছে এই এখনকার ভৃত্য ও প্রভু দুইই নূতন, কাহারও হৃদয়ে পুরাতন ভাব নাই; কাজে কাজেই উভয়ে উভয়ের ছিদ্রান্বেষী। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ এখন একটা চুক্তিমাত্র দাঁড়াইয়াছে। তুমি ভৃত্য, তোমাকে আমি এই এই দিব এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমি এই এই চাই; মন যায়ত চাকরি লইতে পার। ভৃত্য ভাবিল এই এই পাইলে আমি এই এই করিব। যখন সম্বন্ধটা এইরূপ দাঁড়াইল, তখন যে কোন পক্ষই অপর পক্ষের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না, একটু অনুধাবন করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। যেখানে একটা সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্রে দাঁড়ায়, সেখানে দুই পক্ষেরই কেবল নিজের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবা অবশ্যম্ভাবী। যাহা কিছু চুক্তির বাহিরে মনে হইবে, কোন পক্ষেরই তাহা করিতে ইচ্ছা হইবে না এবং কখনও এক পক্ষের—কখনও অন্য পক্ষের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। যেখানে কোন একটা সম্বন্ধ চুক্তির মধ্যে গণ্য হয়, সেইখানে তাহা হৃদয়বিহীন হইয়া পড়ে। চুক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে আইনের কথা, ইহার ভিতর হৃদয় স্থান পাইতে পারে না।

বর্ত্তমান কালের প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অনেকটা চুক্তির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মুনীব ও চাকরের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, প্রভুর প্রতি ভক্তি ও ভৃত্যের প্রতি স্নেহ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের এই সম্বন্ধটা একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের হইত, এখন উহা দেনেওয়ালার সঙ্গে করনেওয়ালার সম্বন্ধ মাত্রে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য আজকাল আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যেও কখন কখন প্রভু ভৃত্য আইনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীদের সময়ে কিন্তু এমন ছিল না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ধনীদের গৃহে দূরে থাকুক, অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহেও অনেক দিনের পুরাতন চাকর ঝি থাকিত। তাহাদিগকে বাড়ীর পরিবারভুক্ত মনে হইত, বাড়ীর কর্ত্তা বা গৃহিণী যেমন নিজেদের ছেলেমেয়ের আবদার সাহ্লাদে সহ্য করিতেন, তাহাদের আবদারও সেইরূপ করিতেন,

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে পিলেদিগকে তাহারা অবাধে শাসন করিত, কেহ তাহাদিগকে তাচ্ছিল্য বা অনাদর করিত না। তখনকার ভৃত্য "চাকর" বলিয়া এবং ঝি "দাসী" বলিয়া আখ্যাত হইত না, বাড়ীর সকলকার সঙ্গে তাহাদের একটা "গ্রাম-সম্পর্ক" থাকিত। ভৃত্য কেনারাম তখন কর্ত্তা গৃহিণীর "কিনু", তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের "কিনু" দাদা এবং পৌত্র পৌত্রীদিগের "কিনু" জেঠা। তাহাকে চাকর বলিতে কেহ সাহস পাইত না, অথবা তার সম্বন্ধে ওকথা কাহারও মনোমধ্যে উদিত হইত না। চাকর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ঝী সম্বন্ধে তাহাই ছিল। মন্দাকিনী ঝী অনেক সময়ে "মন্দা", "মন্দা" দীদী বা "মন্দা" পিসী বলিয়া অভিহিত হইত। ভৃত্যাকে "ঝী" বলাটা কি সুন্দর ও সহৃদয় প্রথা! পূর্ব্বে সে কন্যাভাবে লালিত পালিত হইত, দাসী ভাবে নয় আজকাল কিন্তু কোন কোন স্থানে ভৃত্যকে "চাকর" বলিয়া ও ঝীকে "দাসী" বলিয়া ডাকিতে শুনা যায়। আমার চক্ষে এরূপ প্রথা বড় নির্ম্মম ও কদর্য্য বলিয়া ঠেকে। পূর্ব্বে যে শুধু অনেক দিনের ভৃত্য দেখা যাইত, তাহা নয়, অনেক সময় কোন কোন পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে কোন বাড়ীতে ভৃত্য থাকিত। আজ কাল এই সব প্রথা অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে বা শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যাইতেছে।

এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ চুক্তিমাত্রে দাঁড়াইয়াছে কেন? হৃদয়ের মায়া মমতার চিহ্ন উহা হইতে উঠিয়া যাইতেছে কেন? আজ কাল স্বাধীনতার দিন—অর্থনীতির দিন পড়িয়াছে। পুরাতন সবই চলিয়া যাইতেছে। সকল বিষয়েরই ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে। যখন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, মাতা সন্তানের সম্বন্ধ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বা হইয়াছে, তখন কি করিয়া আশা করা যায় যে, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্বের ন্যায় অটুট থাকিবে, তাহাতে পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়িবে না? যেখানে সবই পরিবর্ত্তনশীল, সেখানে একটা বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না; হইলে চলিবে কেন? অতি পুরাকালের কথা জানি না, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে স্বাধীনভাবের এত বহুল প্রচার ছিল না, চিরাগত প্রথার প্রভাব খুব ছিল, পিতৃ-পিতামহ যাহা করিয়া আসিয়াছেন, পুত্র পৌত্র তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিতেন। এখন সকল লোকের মন হইতে অল্প বিস্তর এ ভাব চলিয়া যাইতেছে। কাজে কাজেই প্রভু ভৃত্যের পূর্ব্ব সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে এখন স্বাধীনতার দিন উপস্থিত। দেশের পুরাতন ব্যবসা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু নূতন ব্যবসাও কতক কতক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকের চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে এখন অনেকে অনিচ্ছুক।

সহর অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি করিলে কথাটী বেশ বুঝা যাইবে। কলিকাতা ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটের কল, কাগজের কল প্রভৃতি অনেক কল হইয়াছে। ইহাতে অনেক লোক কাজ পাইতেছে। কলে কাজ করিলে বেশ দু পয়সা পাওয়া যায়, এবং নিয়মিত ছয় ঘণ্টা কাজ করার পর কলের লোক জন সব স্বাধীন। অতিরিক্ত সময় যদি কখনও কাজ করিতে হয়, তার জন্য অতিরিক্ত পয়সা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সব লোকের দাসবৃত্তি প্রধান অবলম্বন ছিল, এখন তাহারা উহা ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে। দাস্যবৃত্তিতে আয় কম এবং অধীনতা বেশী। গৃহস্থের বাড়ীর চাকর দিন রাত্রির চাকর। একটুকু সময় নিজের বলিতে পারে, ইহা তাহার নাই। কাজেই কলে কাজ পাইলে অনেকে আর দাসত্ব করিতে রাজী হয় না। কলের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ডক জেটী প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

কল কারখানা ছাড়া আরও উপার্জ্জনের নূতন পন্থা কতক হইয়াছে। অল্প দিনের ভিতর দেশে পাট, নীল, গম, চা প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মণ বিজ্ঞানবিদের প্রতিযোগিতায় নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে বটে, কিন্তু পাট চা প্রভৃতির চাষ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাগমের এই নূতন উপায় হওয়ায় লোক নিতান্ত অপদার্থ না হইলে আর দাসত্ব করে না। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বেহার অঞ্চল হইতে চাকরের আমদানী হইত। আজ কাল অনেক বেহারী চা বাগানে গিয়া থাকে। আসাম ব্রহ্মদেশ ত ঘরের কথা হইয়া পড়িয়াছে; কত লোকে পয়সার চেষ্টায় সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। দেশে রেল বিস্তার হওয়ায় অনেক লোকে কাজ পাইয়াছে ও পাইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ত্ত-বিভাগে এবং গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসাদারদের আফিসে অনেক লোক কুলি পেয়াদা প্রভৃতির কাজ করিতেছে। সকল বিভাগের নাম ধরিয়া উল্লেখ অনাবশ্যক। এমন কথা বলি না যে, যে সব লোক এই সব কাজে ব্যাপৃত, তাহারা সকলেই চাকর-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। চা বাগান, খনি প্রভৃতিতে অনেক সময় এরূপ লোকে কাজ করে যাহারা কখনও দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিত না বা করিতে পাইত না। নানা রকম ব্যবসায়ের উল্লেখ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখান যে, আজ কাল নিম্নশ্রেণীর লোকের উপযোগী নানা কাজের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে দাস্যবৃত্তিতে আয় অনেক কম। খোরাক পোষাক ছাড়া চাকরের মাহিনা জোর ৪ টাকা ও স্ত্রীর জোর ৩ টাকা। পূর্ব্বে যখন লোকের অভাব কম ছিল এবং আবশ্যক বস্তু সকল অনেক সস্তা ছিল, তখন মাহিনা আরও

কম থাকা সত্ত্বেও লোকের দাস্যবৃত্তিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। এখন অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, সামান্য লোকেরও জুতাজোড়াটী, ছাতাটী ও কামিজটী না হইলে চলে না, কাজেই অল্প আয়ে সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে লোক পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল, কল কারখানায় সে যদি মাসে ১২।১৪ টাকা উপায় করিতে পারে, দাস্যবৃত্তির ৮।১০ টাকায় কেন সে সন্তুষ্ট থাকিবে ?

সকল কথারই আভাস উপরে দিয়াছি। এখন কেবল তাহা একটু বিশদ ভাবে বলা যাইবে। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। আমার বক্তব্য গুলি ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সাজান হইতেছে না, বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকারা দয়াপূর্ব্বক এ কথা মনে রাখিয়া যেন আমার সাজানর দোষ মার্জ্জনা করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন স্বাধীনতার দিন পড়িয়াছে। লোকের চক্ষু ফুটিতেছে, স্বার্থের দিকে বেশী টান হইতেছে, সেই জন্য দাস্যবৃত্তি অসন্তোষকর ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। যদিও খুব ধীরে ধীরে তবু ক্রমে ক্রমে দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রচার হইতেছে। শিক্ষার এক অনিবার্য্য ফল আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধি, নিজ অবস্থার অসন্তোষ ও আত্মসম্মানের বিকাশ। সাধারণ শিক্ষা সামান্য হইলেও, ইহার বিস্তার বহুল না হইলেও, ইহার ফল ক্রমে ক্রমে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অভাব পূরণের জন্য লোকে নিজের গ্রাম বা মহকুমা বা জেলা পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নয়। পূর্ব্বে যাহাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহাদের পুত্র পৌত্রেরা এখন অকুতোভয়ে ঔৎসুক্যের সহিত "সাগর ডিঙ্গে, গিরি লঙ্ঘে" দেশ দেশান্তরে যাইতেছে। "গ্রামে কাজের সুবিধা নাই, চল সহরে যাই ; সহরে নাই, চল কলিকাতায় যাই" এইরূপ ভাব অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে সব নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাহা নয়। তবে শিক্ষাবিস্তার হইলে যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের উপরেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-প্রসাদাৎ দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। চোর ডাকাত লাঠিয়ালের ভয় অনেক কমিয়াছে। লোকের স্থানান্তরে যাইবার ব্যাঘাত অনেক অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বিদেশে-যাওয়া এক ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। চোর ডাকাতের উপদ্রবের কথা ছাড়িয়া দিলেও পথে লাঠিয়ালের উপদ্রব বেশ ছিল। অনেক জেলা হইতে তাহাদের কিম্বদন্তী আজও তিরোহিত হয় নাই। আজ কাল এই সব উপদ্রব অনেকটা উপশান্ত, কাজেকাজেই লোক অর্থের অন্বেষণে দূরদেশে যাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

আর এক কথা। কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে রাস্তা ঘাটের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। অনেক স্থলে রাস্তা বলা যাইতে পারে, এমন কিছু ছিল নাই বলিলে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে রাস্তা ঘাট পুল প্রভৃতি অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। পথিক-দিগের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাহা ছাড়া চারিদিকে রেলওয়ে ও ষ্টীমার পথ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই মনে থাকিতে পারে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ণু লোকবলসম্পন্ন লোকের পক্ষেও গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া কি বিরাট ব্যাপার ছিল। এখন কিন্তু রেল বা ষ্টীমার যোগে যে সে অবাধে যেখানে সেখানে যাইতেছে। ছয় দিনে লোকে ছয় মাসের পথ গমন করিতেছে। পেটের দায়ে বা অবস্থার উন্নতির চেষ্টায় কত লোক কত কত জায়গায় যাইতেছে। পূর্ব্বে যাহাদের গ্রামের বাহির হইবার উপায় ছিল না, গ্রামে যে কাজ জুটিত তাহা গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, এখন তাহারা অনায়াসে তিন চারি জেলা পার হইয়া দেশান্তরে যাইতেছে। পাঠক পাঠিকারা সকলেই এই সব অবগত আছেন, এ সম্বন্ধে বেশী লেখা তাঁহাদের বুদ্ধির অবমাননা করা ভিন্ন আর কিছু নয়।

যে যে কারণে পুরাতন ও নূতন ভৃত্যের মধ্যে এত প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কতকগুলির কিঞ্চিৎ আভাস উপরে দেওয়া হইল। পুরাতন ও নূতন প্রভুর মধ্যে প্রভেদের কারণ কি তাহার আলোচনা আবশ্যক। বিস্তীর্ণ আলোচনা আমার ক্ষমতাতীত এবং বামাবোধিনীতে স্থানের প্রাচুর্য্য নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে।

ভৃত্যকে আমরা যে আর পূর্ব্বের চক্ষে দেখি না, তাহা কতকটা বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে। এখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার। ইংরাজী শিক্ষা প্রচার হওয়াতে ইংরাজী ভাবও আমাদের মনে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। না করাই আশ্চর্য্য। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিত্র ও অর্থনীতি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেই জ্ঞাত ভাবেই হউক আর অজ্ঞাত ভাবেই হউক, আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকসমূহের চরিত্র ইংরাজী ছাঁচে গঠিত হইতেছে। ইংরাজ যাহা ভাল বলেন, আমাদের তাহা ভাল; তাঁহাদের যাহা মন্দ, আমাদেরও তাহা মন্দ। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের পোষাক পরেন, আমরাও তাঁহাদের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাঁহারা ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কন ও চিঠিপত্র লেখেন, আমরাও যতদূর সাধ্য, ঐ সব বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করিতেছি। বাহুল্যভয়ে বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না, পাঠক পাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন। এখন ইংরাজ সমাজে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অর্থ-নীতির নিয়মে পরিচালিত, তাহাতে হৃদয়ের গন্ধও নাই। অন্যান্য নানা প্রকার চুক্তির মধ্যে উহাও একটা চুক্তিমাত্র। বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিলে

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার উপর ভারতপ্রবাসী ইংরাজের দেশীয় ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। সকল সাহেবই যে চাকরের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, এমন বলি না; কিন্তু যাঁহারা কুব্যবহার করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিই কখন কখন সংবাদপত্র দ্বারা জাহির হয়। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যে সব ইংরাজ দেশীয় ভৃত্যের প্রতি সুব্যবহার করেন, তাহা প্রায়ই অভাবপক্ষে ভাল, প্রকৃত পক্ষে ভাল নয়। তাঁহাদের কোমল ব্যবহার প্রায় হৃদয়-রস-বিহীন। তাঁদের চাকরেরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জীব, এ কথা তাঁরা কখনও ভুলেন না। তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের চাকরদিগকে এক জীব-শ্রেণীভুক্ত করা তাঁহাদের বিজ্ঞানানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। যাহাহউক এ সব কথা এখন যাউক। আসল কথা হইতেছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত, অৰ্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও আজ কাল তাঁহাদের ভৃত্যবর্গকে অনেকটা ইউরোপীয় নেত্রে দেখিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদিগকে ইংরাজের ন্যায় তাড়না করেন এবং সময় সময় প্রহারও করেন। তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের ভৃত্যের প্রতি সস্নেহ ভাব আর তাঁহাদের নাই। তাঁহারা আর তাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হন না। তাঁহারা মাহিনা দেন এবং মাহিনার উপযুক্ত কাজ পাইলেন কি না, এই মাত্র দেখেন। অনেকের হৃদয় হইতে ইহার বেশী দেখিবার ক্ষমতাও বোধ হয় তিরোহিত হইয়াছে। অনেকে চাকরকে মানুষের মধ্যে ধরেন না। প্রভু ভৃত্যের পুরাতন সম্বন্ধ যে ইঁহাদের মধ্যে ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে পরস্পরের সম্বন্ধ চুক্তিমাত্রে দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)।

ডুমরাওন ভ্রমণ।

আরায় কার্য্যোপলক্ষে অবস্থানকালে একদিন ডুমরাওনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই নগরটী কলিকাতা হইতে চারিশত এক মাইল দূরে। এখানকার মহারাজাগণ আপনাদিগকে স্বনামখ্যাত বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। আরার সিপাই-বিদ্রোহের সময় ডুমরাওনের মহারাজ ইংরাজদিগকে অনেক সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

ডুমরাওনের নামের উৎপত্তি বিষয়ে একটী মনোহর গল্প আছে। ডুমরেজিন-

নাম্নী একটী অসামান্যসৌন্দর্য্যসম্পন্না ব্রাহ্মণ-বালিকা বিবাহের পর স্বামিসহ শ্বশুরালয়ে আগমন করিতেছিলেন। এক মুসলমান রাজপুত্র তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া হরণমানসে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত পথরোধ করে এবং ডুমরেজিনকে পাইলে অনর্থক রক্ত-পাত করিবে না, ইহাও জ্ঞাপন করে। মুসলমানের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে কুপিতা হইয়া তেজস্বিনী বালিকা স্বয়ং অনুচর-বর্গ সহিত রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হন। সতী রমণীর আশ্চর্য্য পরাক্রমে যবনগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে।

কুসুম ফুটিয়া উঠে
মরুভূ-হৃদয় হতে,
মুঞ্জরয়ে শুষ্ক তরু
সতীর চরণ-পাতে।

সতী রমণীর প্রভাবে অসাধ্য সাধিত হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়।

কিন্তু এই সাফল্যের আনন্দ ব্যসনে পরিণত হইল! এই অসমান সংঘর্ষণ-ফলে ডুমরাজিনের স্বামী হত হন। সতী রমণী মৃত পতি-পদ বক্ষে ধারণ করিয়া অম্লানবদনে চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন! ইহাই সতীত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যে দেশে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মত্যাগ ও সতীত্বের অনন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সে দেশে এরূপ চিত্র বিরল নহে। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানীয় মহারাজা ঐ সতীদাহস্থানে একটী "মঠ" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই ডুমরেজিনের নামানুসারে স্থানটীর নাম ডুমরাওন হইয়াছে।

সুচারু কানন-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদটী অতীব সুন্দর। বর্ত্তমান মহারাণী বেণী-প্রসাদ কুমারী অতিথিবাসের নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহারাণী বড় কার্য্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী, রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য তিনি সাহেব কার্য্যাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে দেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যে তাঁহার স্বাধীন কার্য্যকারিতা, দানশীলতা ও অপরাপর সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে অনেক প্রকার প্রাচীন পুস্তক ও দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমেত কয়েকটী যাদুঘর (Museum) এবং গবর্ণমেণ্টের একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে।

এখানকার "বড় বাগ" নামক উদ্যানটী আরার উদ্যান অপেক্ষা সুন্দর। "জলের" মধ্যস্থলে একটী মান-মন্দির আছে। উহার উপরিতলের গৃহগুলির প্রাচীর নানা প্রকার পশুপক্ষীর চিত্রে পরিপূর্ণ। যে দেশের কবিগণ বিপুল কল্পনা ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক "শকুন্তলা" প্রভৃতির ন্যায় মনোহর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে দেশ চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় কি জন্য সমধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা বিস্ময়াবহ।

ডুমরাওন ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে

পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখে ভারতের তৎকালীন অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয়। যে অসভ্য বর্ব্বরদিগের হস্তে গ্রীস্, রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য রাজ্যগুলি বিলয় প্রাপ্ত হওয়াতে জগতের উন্নতিস্রোত বহুদিন তরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যাহাদের প্রবল আক্রমণে ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ও সভ্যতা ধ্বংসমুখীন হইয়াছিল, বিক্রমাদিত্য সেই বর্ব্বর বন্য জাতিকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে সুবর্ণযুগ পুনরানয়ন করেন। ভারতের সেই সুবর্ণযুগের প্রতিভাশালী মহাকবি নবরত্ন-শ্রেষ্ঠ ভারতীর বরপুত্র কালিদাস, যাঁহার অমৃতময়ী বীণার গানে ভারত বিমুগ্ধ, যাঁহার কমনীয় লালিত্যপূর্ণ কাব্যাবলী জগতের এত আদরের দ্রব্য, তাঁহার লীলাস্থান এখন শ্মশানে পরিণত! বিশ্বধ্বংসী কালের কি অপ্রতিহত গতি!

কালের করাল কর
মুছে ফেলে অবহেলে,
অক্ষয় কীর্ত্তির চিত্র
অতুলিত ধরাতলে।
বসায় 'পাদপ আনি
রম্য হর্ম্যশির' পরে,
সুচারু নগরী-হৃদে
শ্মশান সৃজন করে।

ভুবনমোহন মিত্র।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুটিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১।
ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদং ॥২।

এই বৃন্দাবনে গোঁসাইয়ের যাত্রী একদিন থাকে। বৃন্দাবনের মহিমা বর্ণন করা আমার মত ক্ষুদ্র-জীবের সাধ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামিপাদোক্ত উপরিস্থিত শ্লোকদ্বয়ে বিজ্ঞ ভক্তগণ অনুভব করিয়া দেখিবেন শ্রীবৃন্দাবন কিরূপ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের আধার। গোস্বামিপাদগণ স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন "চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন, চর্ম্মচক্ষে ভাসে যেন প্রপঞ্চের সম।" আমাদের মায়াময় চক্ষু, আমরা বৃন্দাবনকে ইতরেতর মায়িক বস্তুর ন্যায় দেখিয়া থাকি। আর প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমনেত্রে এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ অতুলন বৃন্দাবনধামের স্বরূপ সহিত

বেদ বিধির অগোচর রত্নবেদীর উপর নিজ নিজ প্রাণারামকারী লীলার সময় প্রাণনাথের রাসবিলাসাদি বিবিধ কৌতুক কেলি দর্শন এবং মানসে বিবিধ সেবা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। শুনা যায় চিন্তামণি হস্তে লইয়া যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। তদ্রূপ ভক্তগণ এই বৃন্দবনধাম রূপ চিন্তামণির স্পর্শে আপনাপন অভীষ্ট সেই সচ্চিদানন্দময় হরিকে লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ সহ নিত্যানন্দে মগ্ন হইতেছেন।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত কত ভক্ত সাধু বনদর্শন করিয়া কেহ বা হাস্য, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা স্তম্ভন ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে।" আমাদের মত অল্পবুদ্ধির এই প্রেমা বুঝিবার সাধ্য কোথায়? যাহা হউক এবিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বৃন্দাবনের মহিমা, বৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা, ভক্তগণের মহিমা এবং ভক্তিতত্ব প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য গোস্বামিপাদগণ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে মহানুভব ব্যক্তিগণ সমুদয় তত্বের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গ কৃষ্ণভক্তি হয়।" আমরা গোস্বামিকৃত গ্রন্থসমূহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ বলিয়া মনে করি। এস্থলে আর একটী কথা লিখিতে হইল— শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই ভগবান আপন মুখে ব্রহ্মাকে কহিতেছেন যে, "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।" এখন শ্রীবৃন্দাবনবিষয়ক বিজ্ঞানসমন্বিত পরম গুহ্য এবং রহস্যপূর্ণ যে জ্ঞান, তাহা সাধারণের গোচর করা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির একেবারে অসম্ভব। তজ্জন্য এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনধামের বহিরঙ্গে যে যে স্থান দর্শনীয়, পঞ্চক্রোশী পরিক্রমণ অনুসারে সে সমস্ত কোনও গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

প্রথমে শ্রীযোগপীঠ করিব দর্শন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধার মদনমোহন॥
তবে শ্রীগোপীনাথ জগমনোহারী।
বামে শ্রীজাহ্নবী জীউ দক্ষিণে কিশোরী॥
তার পর সর্ব্বস্থান করিব দর্শন।
ক্রমে ক্রমে দেখিব ও সব বৃন্দাবন॥
সরস্বতীকুণ্ড আর দাবানলকুণ্ড।
বলভদ্রকুণ্ড যার প্রতাপ প্রচণ্ড॥
আদিবরাহ আর মদনটের জবাটবী।
সৌভরি আশ্রয় হয় আর মঞ্জুটবী॥
অম্বিকা কানন বড় দেখিতে সুন্দরে।
অক্রয় কদম্ব হয় কালীদহতীরে॥
ফলপুষ্প তীর্থস্থানে সমর্পিত করি।
দ্বাদশ আদিত্য ঘাটে বন্দনা আচরি॥
পরেতে গোপালঘাট সূর্য্যঘাট আর।
শ্রীযুগল ঘাট বড় দেখিতে সুন্দর॥
মণিতে রচিত ঘাট দেখিতে বিস্তর।

বেহারি ঘাটের হয় মহিমা বহুতর ॥
ঘাপরের তরু শ্রী আমলীতলা নাম।
আপনে শ্রীমহাপ্রভু করিলা বিশ্রাম ॥
শ্রীসিঙ্গার বট সে যে অতি রম্য স্থান।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যাঁহা বিরাজমান ॥
তবে শ্রীগোবিন্দঘাট পরে চারি ঘাট।
শ্রীভ্রমরঘাট বহু কৃষ্ণ কৈল নাট ॥
পরেতে কিশোরীঘাট করি দরশন।
তবে যাব কেশীঘাটে হর্ষযুক্ত মন ॥
মণিকর্ণিকার ঘাট অতি গূঢ়তর।
বাঞ্ছাপূর্ণকারী সর্ব্বতীর্থের ঈশ্বর ॥
শ্রীরাধারমণ প্রভু রূপ প্রেমময়।
আপনে প্রকাশ হইল ভক্তের ইচ্ছায় ॥
শ্রীনিধুবন তার মহিমা অধিকা।
রাজধানী স্থানে রাজা হন শ্রীরাধিকা ॥
শ্রীআঁধারিয়া বট করি দরশন।
শ্রীবংশীবটে গিয়া করিব প্রার্থন ॥
শ্রীগোপেশ্বর জগতের হিতকারী।
বৃন্দাবনে বাস যেহ দেন কৃপা করি ॥
দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র করিলেন লীলা।
কৃষ্ণদাসে কৃপা করি প্রকট হইলা ॥
অপূর্ব্ব মন্দিরশোভা সুশ্বেত প্রস্তরে।
এমন মন্দির নাহি ব্রহ্মাণ্ডভিতরে ॥
মন্দিরের নাট্যশালা জগমনোহারী।
একমুখে সেই শোভা বলিতে না পারি ॥
কিশোর বয়সে প্রকট রত্নবেদিপরি।
দক্ষিণে ললিতা শোভে বামে শ্রীকিশোরী ॥
শ্রীপুলিন গোপেশ্বর শ্রীব্রহ্মকুণ্ড বেড়া।
মধ্যে শ্রীমন্দির যেন সুমেরুর চূড়া ॥
প্রীত সেবা পরিপাটী সদাই আনন্দ।
প্রেম সেবায় বশ হইয়া প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র ॥

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড করেন সর্ব্বজীব হিত।
দর্শন স্পর্শন স্নানে জগত পবিত ॥
ব্রহ্মকুণ্ডবাসী হন যত সাধুজন।
পরম বৈরাগ্য সব নিত্যসিদ্ধ হন ॥
শ্রীগোপীনাথের বাগে হন যতেক বৈষ্ণব।
বৈরাগ্যতা পার হন নিত্যসিদ্ধ সব ॥
শ্রীমদনমোহনের বৈষ্ণব আছে যত।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী সব পরম পণ্ডিত ॥
পুলিন গভর বন রাধাবাগ নাম।
যাহাতে বিরাজ করেন শ্রীরাধাশ্যাম ॥
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড আর কেয়ারিকা কুণ্ড।
তথায় থাকেন বৈষ্ণব প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
নির্ম্মৎসর নিরপেক্ষ বৈরাগ্যের সীমা।
অন্তর্মনা প্রেমসেবা অতুল মহিমা ॥
শ্রীগিরিধারী আর শ্রীগোপাল দেব।
শ্রীচিকনিয়া শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব ॥
নিভৃত নিকুঞ্জবন কৃষ্ণের বিলাস।
নিশীথসময়ে সেই স্থানে নিত্য রাস ॥
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সদা সীতার সহিতে।
বিরাজ করেন সদা জীব উদ্ধারিতে ॥
পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী হন সেই খানে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সহকারী রাত্রি দিনে ॥
শ্রীরাধা দামোদর শ্রীশ্যামসুন্দর।
গোকুলানন্দ রাধাবিনোদ ব্রজ মনোহর ॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বঙ্কবিহারী রাধাশ্যাম।
বৃন্দাবনচন্দ্র হরি দেব সুখধাম ॥
বলরামচন্দ্র শ্রীমুরলী মনোহর।
শ্রীরাধামোহন নন্দকিশোর নটবর ॥
কেশব রাধামাধব জানকীরমণ।
সজল চিকণ রাধাবল্লভমোহন ॥
গোবিন্দ গোপাল আর নিত্য গোপাল।

চতুর শিরোমণি আর গৌর গোপাল ॥
পুলিনবিহারী আর অনন্ত বিহারী।
ললিতমাধব নৃসিংহদেব মনোহারী॥
কালীয়দমন আর নর্ত্তন গোবিন্দ।
রাধা ব্রজানন্দ সিঙ্গারবিহারী গোবিন্দ ॥
বৃন্দাবনে রাসলীলা সদাই আনন্দ।
চৌদিকে যুগল মাঝে শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥
শ্রীযমুনা পাটরাণী আছেন বেষ্টিত।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সর্ব্বদা পিরীত ॥
বৃন্দাবনে কত ভক্ত আছেন নির্জ্জনে।
রাধাকৃষ্ণের লীলাতে থাকেন রাত্রদিনে ॥

ইহা ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে ছোট বড় আরও অনেক বিগ্রহ দর্শন আছে এবং জগৎ-শেঠের ঠাকুরবাড়ী, রংজীর বাগিচা, গরুড়স্তম্ভ, যাহাকে লোকে সোণার তাল-গাছ বলে, দর্শনীয় আছে। জয়পুরের রাজার গুরু ব্রহ্মচারীর ঠাকুরবাড়ীও দর্শন-যোগ্য, আর পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার মধ্যে ছোট বাউড়ি ও বড় বাউড়ি নামে সাধু শাস্তের বাসযোগ্য ভূগর্ভ-প্রোথিত কুণ্ডাকৃতি দুইটী আশ্রম বড়ই আনন্দজনক। বৃন্দাবনে ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী কুণ্ড আছে। বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনের পূর্ব্বদিকে যমুনা পার হইয়া মানসরোবর নামক একটী মনোহর সুরম্য নির্জ্জন স্থান দর্শন করিয়া পাণিঘাটে যাত্রা স্থাপিত হয়। মানসরোবরের ইতিহাস ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চিত্তপ্রসাদ।

বাল্মীকির তপোবন অতিশয় সুশোভন,
পবিত্রতা প্রফুল্লতাময় ;
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি নীচতার লেশ,
সর্ব্বজীবে আনন্দ উদয়।১

কুরঙ্গ শার্দ্দূল সনে ক্রীড়া করে এক বনে,
মৃগপতি সনে যূথপতি ;
ভুজঙ্গ বিপুল-কায় হিংসা নাহি করে কায়,
শিখিসনে তাহার বসতি।২

নিত্য শুনি ঋষিমুখে বৃক্ষশাখে বসি সুখে
পক্ষিগণ করে বেদগান ;
সুরধুনী পুণ্যতোয়া পুণ্যাশ্রম প্রক্ষালিয়া
মন্দগতি সিন্ধু পানে যান।৩

মহর্ষির তপোবন চির-সুখ-প্রস্রবণ
রোগ শোক কেহ নাহি জানে ;
সবে মাত্র একজন সদা নিরানন্দ-মন
চিরানন্দময় এই স্থানে।৪

জনক-তনয়া সতী দুঃখেতে কাতরা অতি,
মূর্ত্তিমতী বিষাদ-রূপিণী,
সুখ-রবি অস্তমিত, চিরতরে নিমীলিত
রঘু-কুল-সর-সরোজিনী।৫

একদা সায়াহ্ন বেলা তরুলতা সাথে খেলা
করিতেছে সন্ধ্যার সমীর ;
কুমুদ-রঞ্জন আসি গগনে উদিল হাসি,
অস্তাচলে চলিল মিহির।৬

বিজন-কুটীরে বসি যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী,

কে ও বামা বিষাদে মগনা ?
সজল করুণ আঁখি, করেতে কপোল রাখি,
শীর্ণকায়া বল্কল-বসনা।৭
পূর্ব্ব লাবণ্যের ভাতি হইয়াছে ম্লানজ্যোতি,
বিগুমান চিহ্নমাত্র তার ;
সরলতা কোমলতা মুখচন্দ্রে বিরাজিতা,
সতীত্বের সুচারু আধার।৮
কহে বামা ধীরে ধীরে "এতদিনে বৈদেহীরে
ভুলিলে কি বৈদেহী-বিলাসী ?
রঘুবংশ-চূড়ামণি তুমি করুণার খনি,
চিরদিন জানিত এ দাসী।৯
চিরদিন ছিল জ্ঞান তুমি সীতাগতপ্রাণ,
অন্যে তুমি কভু রত নহ ;
কিবা দিবা কি যামিনী ইহা ভাবি অভাগিনী
সহিয়াছে সন্তাপ দুঃসহ।১০
তোমার সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রজারঞ্জন,
তাহে নাহি দেখি কোন দোষ,
অকাতরে এই প্রাণ দিতে পারি বলিদান
সাধিবারে তোমার সন্তোষ।১১
যদ্যপিও অভাগিনী হইয়াছে কাঙ্গালিনী,
বিনাদোষে চির-নির্ব্বাসিতা,
কিন্তু তব স্নেহরাশি অনশ্বর অবিনাশী
চিরদিন জানিত যে সীতা।১২
ভাবিতাম অহরহ 'দারান্তর-পরিগ্রহ'
কভু নাহি করিবেন রাম,
প্রজারঞ্জনের তরে যদিও ত্যজিলা মোরে,
কিন্তু তিনি মোরে নন বাম।১৩
তাঁর তরে মম প্রাণ শোকানলে দহমান
হয় যথা দিবস রজনী,
মম হেতু অহর্নিশ বিষম-বিষাদ-বিষ
তাঁর (ও) হৃদি দহিছে এমনি।'১৪
কিন্তু আজি ক্রূর বিধি ভাঙি চুরি দিল হৃদি,
শিরে আজি পড়িল অশনি,
কহিলেন তপোধন অশ্বমেধ আরম্ভন
করিয়াছ তুমি রঘুমণি।১৫
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান কোন মতে সমাধান
জায়া বিনা কভু নাহি হয়,
করিয়াছ রঘুবর পরিগ্রহ দারান্তর,
ইথে আর নাহিক সংশয়।১৬
দেবরের মুখে শুনি বিনাদোষে রঘুমণি
তেয়াগিলে তুমি জানকীরে,
সেই ক্ষণে এজীবন করিতাম বিসর্জ্জন
প্রবেশিয়া ভাগীরথী-নীরে।১৭
কিন্তু তব পুত্রদ্বয় সেকালে জঠরে রয়,
এই হেতু রাখিনু জীবন ;
দয়া করি তপোধন করি' হেথা আনয়ন
কন্যাভাবে করিলা পালন।১৮
থাকি গৃহে কিম্বা বনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
তুমি মোর আরাধ্য দেবতা,
অনুকূল কিম্বা বাম যাই হও প্রাণারাম,
ইথে কভু নহিবে অন্যথা।১৯
কেবা হেন ভাগ্যবতী পতিরূপে যে যুবতী
পাইয়াছে তোমার চরণ ?"
এতেক বলিয়া সতী বিষাদে কাতরা অতি,
অশ্রুবারি করেন বর্ষণ।২০
হেনকালে শিশুদ্বয় নিকটে আসিয়া কয়
"শুন মাগো ! অপূর্ব্ব ভারতী—
অশ্বমেধ যজ্ঞতরে নিমন্ত্রিতে মুনিবরে
দূত পাঠাইলা রঘুপতি।২১
আইল সন্দেশবহ নিমন্ত্রণ পত্রসহ,
মুনি তায় কৈলা সম্ভাষণ।

মোরা কৌতূহলবশে গেলাম তাঁহার পাশে
শুনিতে সকল বিবরণ।২২
পূর্ব্বে মহর্ষির ঠাঁই পড়িলাম দুই ভাই
শ্রীরামের অপূর্ব্ব আখ্যান,
অলৌকিক গুণগ্রাম পড়ি তাঁরে ভাবিলাম
অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান।২৩
আজি যাহা শুনিলাম সুনিশ্চয় বুঝিলাম
গুণধাম কৌশল্যা-কুমার,
পালিতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম সাধিতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম
ধরাধামে দেব অবতার।২৪
অলৌকিক কর্ম্ম শুনি বিস্ময়-রসে জননি!
অভিভূত হইল হৃদয়,
কি অদ্ভুত পিতৃভক্তি, কি অটল ধৈর্য্যশক্তি,
কি গভীর দাম্পত্য-প্রণয়!২৫
রামায়ণে পড়িতাম কিশোর বয়সে রাম
পিতৃসত্য করিতে পালন,
নির্ভীক অন্তরে বীর শিরে জটা অঙ্গে চীর,
প্রবেশিলা গহন কানন।২৬
সংহতি চলিলা তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ আর
ছায়া যথা দেহানুগামিনী,
রূপে গুণে অনুপমা যেন পদ্মালয়া রমা
প্রণয়িনী জনক-নন্দিনী।২৭
নিবিড় অরণ্যে গিয়া পর্ণশালা বিরচিয়া
নিবাস করিলা তিনজন,
একদা দৈবের গতি দুরাচার লঙ্কাপতি
জানকীরে করিলা হরণ।২৮
ক্ষোভে রোষে রঘুপতি অতিশয় খিন্নমতি
কপিপতি সনে সখ্য করি,
সেতু বাঁধি সিন্ধুনীরে বিনাশিয়া দশশিরে
উদ্ধারিলা জানকী সুন্দরী।২৯
প্রফুল্ল অন্তরে সীতা পতিপাশে উপনীতা,
রাম তাঁয় না কৈলা সম্ভাষ,
সীতা চমৎকৃতা সতী! ত্যজিলা তাঁহারে পতি
ছল ধরি "পরগৃহে বাস।" ৩০
ক্ষোভে দুঃখে পতিপ্রাণা হয়ে অতি ম্রিয়মাণা
আজ্ঞা দিলা সাজাইতে চিতা,
ভীতি-পরিশূন্য মনে প্রজ্বলিত হুতাশনে
প্রবেশিলা জনক-দুহিতা।৩১
ধৈর্য্যশীল দাশরথি, অন্তরে আকুল অতি,
বাহ্য-দৃশ্যে অটল অচল,
ব্যোমস্পর্শে হুতাশন চমকিত ত্রিভুবন
নাগ নর সুরাসুর দল।৩২
ক্রমে অগ্নি সঙ্কুচিত, ক্রমে চিতা নির্ব্বাপিত,
বিভাবসু হয়ে মূর্ত্তিমান,
সঙ্গে লয়ে শ্রীসীতারে (পিতা যথা তনয়ারে)
রামপাশে হন আগুয়ান।৩৩
জানকীর করে ধরি রামে সমর্পণ করি
কহিলেন 'শুন রঘুমণি!
কি কব অধিক আর চরণ-পরশে যাঁর
সুপবিত্রা হইল ধরণী।৩৪
সে সাধ্বীরে অকারণ কেন কর বিসর্জ্জন,
নিজ দারা করহ গ্রহণ।
সুখে রাজ্যে কর গতি', এত বলি স্বাহাপতি
নিজ স্থানে করিলা গমন।৩৫
আনন্দিত সর্ব্বজন সহসীতা শ্রীলক্ষ্মণ
রণজয়ী শ্রীরঘুনন্দন,
ফিরিয়া আপন দেশে বসি নরপতি বেশে
উজলিলা রাজ-সিংহাসন।৩৬
শুনিনু দূতের মুখে বিসর্জ্জিয়া নিজ সুখে
ধর্ম্ম-নিষ্ঠ কৌশল্যা-নন্দন,

প্রজারঞ্জনের তরে প্রাণাধিকা মহিষীরে
চিরতরে করিলা বর্জ্জন।৩৭
শুনিয়া দূতের বাণী অন্তরে বিস্ময় মানি,
জিজ্ঞাসিল মোরা দুই জন—
'করিলা কি রঘুবর পরিগ্রহ দারান্তর
যজ্ঞকার্য্য করিতে সাধন?' ৩৮
কহিলা সন্দেশ-বহ 'দারান্তর পরিগ্রহ
রামচন্দ্র না করিলা আর,
অযোধ্যার অধিপতি সদা একনিষ্ঠমতি,
সীতাগত জীবন তাঁহার।৩৯
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ আর যত গুরুজন
দারান্তর করিতে গ্রহণ
কহিলেন বারম্বার, কিন্তু হেন সাধ্য কার
টলাইবে রাঘবের মন? ৪০
বিচারিয়া মতিমান্ করাইলা নিরমাণ
হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি,
বামে লয়ে মনোরমা জানকীর সে প্রতিমা
যজ্ঞ করিবেন রঘুপতি।' ৪১
ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপ যত্নশীল যেইরূপ
রাজধর্ম্ম করিতে পালন,
দেখাইলা মহামতি দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রতি
অনুরাগ প্রগাঢ় তেমন। ৪২
কর মাতঃ অনুমতি মুনিসহ করি গতি
দর্শন করিতে রঘুরাজে,
বড় মনে আছে সাধ ঘুচাইব বিসম্বাদ
চক্ষু কর্ণ উভয়ের মাঝে।৪৩
কহিলেন তপোধন 'অবিলম্বে বৎসগণ!
জননী নিকটে কর গতি,
অশ্বমেধ দরশনে যাইতে আমার সনে
জননীর লও অনুমতি।' ৪৪
"হিরণ্ময়ী-প্রতিকৃতি নিরমিতা" শুনি সতী
পুলকেতে পূর্ণিত হৃদয়,
সন্তাপ হইল খর্ব্ব অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-গর্ব্ব
হৃদয়েতে হইল উদয়।৪৫
পরিহার-দুঃখভার না রহিল চিতে আর,
সূর্য্যোদয়ে যথা তমোরাশি,
বুঝিলেন—সীতাপতি সদা সীতা-
গত-মতি,
স্নেহ তাঁর নিত্য অবিনাশী।৪৬
সযতনে শিশুদ্বয়ে নিজ অঙ্কে তুলে লয়ে
স্নেহে করি মস্তক চুম্বন,
অনুমতি দিলা সীতা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা
যজ্ঞস্থলে করিতে গমন।৪৭
লভি মাতৃ-অনুমতি হরষিত-মতি অতি
নমি তাঁর যুগল চরণে,
শীঘ্রগতি দুই ভাই চলে মহর্ষির ঠাঁই,
অশ্বমেধ যজ্ঞ-দরশনে।৪৮

ই।

ভারতীয় পুণ্য নদী।

(৪৮০ সংখ্যা—১১৭ পৃষ্ঠার পর।)

ভৈরোঘাটীতে ভাগীরথী জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত পৃষ্টারয়বে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের উচ্চতা

সমুদ্রতল হইতে ২০, ২৯৬ পাদ। ইহার শিখরদেশ সাহারণপুর হইতে দৃষ্ট হয়। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মন্দিরের ন্যায় মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র। সাহারণপুর হইতে সরল রেখায় ৫৩ ক্রোশ দূর। যুক্তধারা এইরূপে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইতেছে। কিছু দূরেই বাদেরি (Batheri) গ্রাম, ভাগীরথীর দক্ষিণ উপ-কূলে অবস্থাপিত। স্রোত হইতে ইহার উচ্চতা ৩০০ পাদ। অদূরে পার্ব্বতীয় প্রবাহ —রিতল নদী ভাগীরথীতে নিপতিত হইতেছে। রিতল গ্রামও অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গ্রামটী ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর, একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বসানুদেশে প্রতিষ্ঠিত। পূতধারা নিম্নদেশ বিধৌত করিয়া কলকল-রবে প্রবাহিত হইতেছে। ভৈরোঘাটী হইতে সার্দ্ধ ছয় ক্রোশ দূরে প্রাচীন সুখী গ্রাম ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলে সমুচ্চ পর্ব্বতের ঢালু দেশে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শিনী নীহারমণ্ডিতা পর্ব্বতমালা। এখানকার দৃশ্য অতি চমৎকার। সহস্র-পাদ নিম্নে কন্দরনিবদ্ধা স্রোতস্বতী কল্লোল-নাদে ফেন-বুদ্‌বুদ উদ্গিরণ করিতে করিতে হিমালয় ভেদ করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা ন্যূনাধিক ১২০০০ পাদ। গ্রামটী ৮৮৬৯ পাদের উপরঃ প্রতিষ্ঠিত এবং ভাগীরথী ৭৬০৮ পাদ উচ্চে প্রবাহিত। সুখী হইতে বক্রগতি প্রবাহ দক্ষিণপশ্চিম-বাহী হইয়া অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে উতল গ্রামে অবতরণ করিতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণবাহী হইয়া সার্দ্ধসপ্ত ক্রোশ দূরে সুরত গ্রামে প্রবাহিত হইতেছে। সুরত হইতে দক্ষিণপূর্ব্ববাহিনী হইয়া সার্দ্ধ চারি ক্রোশ দূরে ভাগীরথী জলকর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। জলকর ভাগী-রথীর অন্যতম প্রবল উপনদী। হৈমবতের তুহিন-গলিতধারা দক্ষিণাভিমুখে দশ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর অঙ্কমধ্যে মিলিত হইয়াছে। জলকর সঙ্গমের চারি-ক্রোশ নিম্নেই পবিত্র বিলং সঙ্গম।

বিলং ভাগীরথীর প্রধান উপনদী। ইহা দৈর্ঘ্যে জাহ্নবী অপেক্ষাও বৃহৎ এবং পবিত্রতাতেও তাহার ন্যূন নহে। ইহার উৎপত্তি-স্থান চিরনীহারালয় হৈমবতের গভীর কন্দর। মূল পর্ব্বত হইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহা তীরী নগরের সন্নিহিত ভাগীরথীর বাম অঙ্কে নিপতিত হইতেছে। বিলং সঙ্গম ২২৭৮ পাদ উচ্চ। সঙ্গমস্থলের আড়াই ক্রোশ ঊর্দ্ধে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বিলংয়ের পরিসর ৬০।৭০ পাদ। বিলং মৎস্যে পরিপূর্ণ। মালারা জালদ্বারা মৎস্য ধৃত করিয়া সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকে। জাহ্নবী রিতল, জলকর ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় প্রবাহ দ্বারা পরিপুষ্ট। ভাগীরথী বিলং সংযোগে সমধিক পরিপুষ্ট ও প্রবল হইয়া মহাবেগে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছে।

বিলং সঙ্গমের কিঞ্চিৎ নিম্নেই তীরী নগর। তীরী একটী সামান্য নগর বা

গ্রাম। ইহা ভাগীরথীর বামকূলে প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রের সমতল হইতে ২৩২৮ পাদ উচ্চ। নিম্নস্থ ভাগীরথীর উচ্চতা ২২৭৮ পাদ। তীরীতে গাড়োবাল রাজার প্রাসাদ ও তৎপারিষদদিগের কয়েকটী গৃহ আছে। অলকানন্দার উপর শ্রীনগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজা তীরী নগরে থাকিতেই ভালবাসেন। প্রাসাদটী সামান্য অট্টালিকা মাত্র, কিন্তু অতি সুন্দর স্থানে নির্ম্মিত। তীরীর কিঞ্চিৎ নিম্নেই কৌড়িগুলা গ্রাম। তথায় ভাগীরথীর উপর এক দৃঢ় সেতু নির্ম্মিত আছে। এখানে ভাগীরথীর পরিসর অধিক না হইলেও বর্ষাকালে ভীষণ আকার দৃষ্ট হয়। সেতুর দৈর্ঘ্য ১৩৮ পাদ। তীরী আলমোরা হইতে ৬১ ক্রোশ দূর।

পবিত্র বিলং সঙ্গমের এগার ক্রোশ দূরে ভীমা ভাগীরথী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া পুণ্যতোয়া অলকানন্দার বাম বক্ষে নিপতিত হইতেছে। ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থানই পুণ্যপ্রদ দেব-প্রয়াগ।

উদাসীনের চিন্তা।

চারুশীলা ভবনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ভবনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়া সরকারী কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং সচ্চরিত্রতার জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত। তাঁহার একমাত্র কন্যা চারুশীলা যাহাতে সদ্‌গুণ-বিভূষিতা হইয়া নামের সার্থকতা করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। একদিন তিনি চারুশীলাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিলেন "মা! এখন তোমার বয়স বার বছর, আমি তোমায় একটি কথা বলিব। সে কথাটি এই—"তুমি বিদুষী হও আর নাই হও, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু সর্ব্বদা যে কাজ সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে সাধন করিবে। ইহাতে কেহ প্রতিবাদী হইলে গ্রাহ্য করিবে না; কারণ যাহা সাধু তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য। সাধু কাজের অনুষ্ঠানে ঈশ্বর প্রীত হয়েন, সুতরাং তাঁহাকে প্রীত করিতে যাইয়া যদি মানুষকে দুঃখিত করিতে হয়, তাহ'তে নিবৃত্ত হইবে না; কারণ তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।" পিতৃদেবের এই উপদেশ চারুশীলার হৃদয়ে অক্ষর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিল। তদবধি সে যাহা ভাল বুঝিত, সৎ বলিয়া জানিত, প্রাণপণে তাহা করিতে চেষ্টা করিত।

চারুশীলা ষোড়শ বর্ষে উত্তীর্ণা হইল। পিতা তখন একটি সুপণ্ডিত পাত্র দেখিয়া কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। চারুশীলা মনোমত স্বামী পাইয়া আনন্দে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। প্রথম প্রথম উভয়ে বিলক্ষণ শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন, উভয়ের মতের

কোনও সংঘর্ষণ নাই। স্বামী যাহা করিবেন ইচ্ছা করিতেছেন, স্ত্রী অবাধে তাহার অনুসরণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে পত্নী যাহা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিতেছেন, পতি তাঁহার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। বাহিরের লোক তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া একবাক্যে বলিতেন "আহা! উভয়ের কি একাত্মভাব, যেন দুইটি জলধারা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এদের গৃহ কি শান্তিপূর্ণ স্থান, উভয়ের মধ্যে একটু মতের পার্থক্য নাই, এঁরাই জগতে প্রকৃত সুখী।" ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন সমালোচকগণ বর্ত্তমান দেখিয়া বিচার করেন, তাই অনাগত কাল অনেক সময় তাহাদের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, ভবিষ্যৎ তাহা মিথ্যা বলিয়া দেখাইয়া দেয়। মানব-জীবনে এতাদৃশ ভ্রান্তি অহর্নিশি ঘটিতেছে। চারুশীলা ও তাহার স্বামী সম্বন্ধেও প্রতিবেশিগণ এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। যত দিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় নাই, যত দিন নব প্রেমের নবমাধুরী উভয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যত দিন উভয়ের রুচিবৈচিত্র্য খেলা করিবার সুযোগ পায় নাই, তত দিন উভয়ের বেশ মিলন ছিল, যেন দুইটি আত্মাই এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইল। উভয়ের রুচি, শিক্ষা, আশৈশব-পোষিত সংস্কার তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সুতরাং উভয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও এত গুলি প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিতেছেন না।

সমস্যাটি চারুশীলার স্বামীর একজন বন্ধুর সহিত পরিচিত হওয়া লইয়া। চারুশীলার স্বামী সুপণ্ডিত লোক ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়া অনেক অসৎসঙ্গী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারা আবার ইংরাজী ধরণের বন্ধু (friend) নামে আখ্যাত। চারুশীলার স্বামী উচ্চ শিক্ষিত যুবক, সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু অনেক সময় বিচার করিতে অক্ষম বলিয়া সীমা অতিক্রম করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহার মতে বাড়ীতে বন্ধু-নামধারী ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত হইলেই তাহার সহিত স্ত্রীর পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে, তাহার চরিত্র সাধু হউক আর নাই হউক; এরূপ পরিচয় না হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অবমাননা করা হয়। চারুশীলার স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণাটা অন্যরূপ। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে "It is better to be alone than to be in bad company" অসৎ সঙ্গ করা অপেক্ষা একা থাকা ভাল। হউন না কেন স্বামীর সঙ্গী, কিন্তু তিনি যদি অসচ্চরিত্র হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করাও বিপজ্জনক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক কখনও অসৎ পুরুষের সঙ্গ করিবেক না। এই ধারণা হইতে তিনি স্বামীকে বলিলেন

"আমি এতাদৃশ পুরুষের নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি না।" স্বামী বলিলেন "স্ত্রী স্বামীর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ও বিশ্বাস করিবেন। স্বামী যদি কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ না করেন, বা কোনও কার্য্যকে মন্দ না ভাবেন, তা হলে স্ত্রীর তাঁহার বাধ্য হইতে কি আপত্তি?" চারুশীলা বলিলেন "সতীত্ব জিনিশটা ঐশ্বরিক, ইহা স্বর্গীয় পদার্থ, স্বামীর মতামতের উপর নির্ভর করে না। স্বামী যদি অবিবেচক হয়েন কিংবা স্ত্রীকে অসৎ পথে নামাইতে কুণ্ঠিত না হন, তাহলেও স্ত্রী কেবল মাত্র ঈশ্বরের দিকে তাকায়ে সতীত্ব রক্ষা করিবেন এবং যে আচরণ সতীত্ব রক্ষার বিরোধী, সে আচরণ প্রাণান্তেও করিবেন না।"

স্বামী—এইটা তোমার ভাবুকতা (sentimentalism)। আমি তোমার সর্ব্বস্ব। তোমার সতীত্ব তোমার ধন নহে, উহা আমারই জিনিশ, উহা যদি আমি ডুবাতে চাই, তোমার বলবার কি অধিকার আছে?

চারুশীলা—আমার সতীত্ব কোনও মানুষের দেওয়া সম্পত্তি নহে। আমায় ঈশ্বর বলেছেন "এই লও তোমার সতীত্ব, এ ধন কখনও হারাইও না, মৃত্যুর পর আমার জিনিশ আমারি নিকট নিয়ে আসবে, অর্থাৎ পতির প্রতি যেমন ঐকান্তিক প্রেম দেখাবে, তাহা হইতে আমার প্রতিও ঐকান্তিক প্রীতি ও ভক্তি কর্ত্তে শিখবে।" আমি তোমার কথায় এ ধন হারাতে পারি না, এখন তুমি একে ভাবুকতা বলে নিন্দা কল্লে নাচার।

স্বামী—এতাদৃশ উত্তর শুনিয়া উত্ত্যক্ত হইয়া বলিলেন "ভাল, জিজ্ঞেসা করি আমি যা কর্ত্তে বলি, তা কর্ব্বে কি না? সতী নারীর লক্ষণ এই, সতী নারী প্রাণান্তেও পতিকে অসন্তুষ্ট কর্ব্বে না।"

চারুশীলা এই যুক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাহার পিতৃদেব-প্রদত্ত উপদেশটি মনে পড়িল। তখন বলিলেন "পতির উপরে সতীর ঈশ্বর রয়েছেন। যদি পতি এমন কোন কাজ কর্ত্তে বলেন যা ঈশ্বর ভালবাসেন না, তিনি সে কাজ প্রাণান্তেও কর্ব্বেন না।"

স্বামী—আমি এতক্ষণ যুক্তি করে ভাল করি নাই। তোমাদের মত স্ত্রীলোকদের তর্ক করে বুজিয়ে উঠা ভার। তোমাদের নিকট যুক্তির চেয়ে বলই বেশী কার্য্যকর। জান আমি তোমার স্বামী এবং প্রভু, তোমার পিতা আমাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা করে দিয়েছেন, এখন আমার যা খুসী তা তোমার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কর্ত্তে হবে।

যে স্বামী পূর্ব্বে কখনও স্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী ছিলেন না, প্রত্যুত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে চারু-শীলার মতেই মত দিয়া কাজ করেছেন, সে স্বামীকে সে দিন তদ্রূপ প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত দেখিয়া চারুশীলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কোন রূপেই মনকে

প্রবোধ দিতে পারিলেন না। তিনি অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে স্বামী পত্নীর তাদৃশ শোকের ভাব দেখিয়া বিরক্তচিত্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তার পর দুই দিন চলিয়া গেল, স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা নাই। শান্তির গৃহে বিষাদের ছায়া পতিত হইল। দাস-দাসীগণ হঠাৎ তাদৃশ কুজ্ঝটিকার আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। চারুশীলা সুখ দুঃখের ভাগী পিতৃদেবকে সমস্ত কথা লিখিয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পিতা অনেক করিয়া চারুশীলাকে বুঝাইয়া লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগ্ন হৃদয় আর যোড়া লাগিল না। তিনি কিছুতেই তাদৃশ প্রভুত্বপ্রিয় একদেশদর্শী অবিবেকী স্বামীর প্রতি পূর্ব্বানুরাগ অটুট রাখিতে পারিতেছেন না। মনের এরূপ অবস্থা লইয়া একত্র বাস করা বিড়ম্বনা, তাহাতে উভয়ের শান্তি নষ্ট হইবে। সকল কথা ভাঙ্গিয়া লিখিয়া তিনি পুনরায় পিত্রালয় যাইতে অভিলাষিণী হইলেন। পিতা দেখিলেন স্বামী স্ত্রীতে মতবৈষম্য জগতে বিরল ঘটনা নহে। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই কিছু না কিছু ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে বিবাহ-সূত্র শত-করা নিরানব্বই স্থলে ছিন্ন হইবার কথা। আবার ইহাও দেখা যায় কিছুদিন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিলে দাম্পত্য কলহের শান্তি হয়। দুইটী মেঘ ঘর্ষণে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু সেই বজ্রাঘাতের পর আবার উভয়ে মিলিয়া শান্তভাবাপন্ন হয়। চারুশীলার পিতা কন্যাকে সে সকল কথা লিখিয়া ধীর ও সহিষ্ণু হইয়া পতি-গৃহেই বাস করিতে বলিলেন। চারুশীলার স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টান্তে নিজেও ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইলেন। তিনি শান্তভাবে বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীর বিবেক ও ধর্ম্মের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন। তিনি সরল ভাবে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও প্রেমের ভাব বর্দ্ধিত হইল—গৃহবিবাদের শান্তি হইল। শ্রীচ।

মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানী ব্যক্তি ও অসভ্য জাতিগণের বিশ্বাস।

এপিক্‌টিটাস নামক গ্রীক দার্শনিকের মত এই—"আত্মার সম্পর্কীয় শরীরই একমাত্র ধ্বংসশীল পদার্থ এবং এই ধ্বংস-শীল শরীর ধারণ আত্মার পক্ষে শব বহন মাত্র।" প্লেটো বলিয়াছেন, "যদি ঈশ্বর আছেন, স্বীকার করিতে হয়, তবে

মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।” রোমান বাগ্মিপ্রবর সিসিরো মৃত্যুর সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসপূর্ণ কথা বলিয়াছেন—“আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস যদি আমার ভ্রান্তিকর হয়, তবে আমি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত এই ভ্রান্তি পোষণ করিব এবং আমি এই অভিলাষ করি যে, যে ভ্রান্তি পোষণ করিয়া আমি আনন্দ প্রাপ্ত হই, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা যেন কেহ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে না পারে।”

সক্রেটিস তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে এথেনিয়ান জনসাধারণ ও বিচারকগণকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—“এখন অন্তপ্রকারে মৃত্যুর স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। এ প্রকারে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব মৃত্যু যে মঙ্গলকর, তাহা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। সম্পূর্ণ ধ্বংসাবস্থা কিম্বা সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনাবস্থা অথবা আত্মার অন্য জগতে প্রস্থান ব্যাপার, ইহার নামই ত মৃত্যু। আচ্ছা, ইহাই যদি অনুমান করা যায় যে, মৃত্যুর অবস্থা একটা সম্পূর্ণ চৈতন্যহীন ও স্বপ্নহীন নিদ্রার অবস্থা, তবে ত ইহাকে মহা লাভকর বিষয় বলিয়া গণনা করা উচিত। কেননা তখন অনন্ত কাল ত একটি স্বপ্নহীন রাত্রি মাত্র হইবে, সে রাত্রির ত আর প্রভাত হইবে না, অনন্ত শান্তি ত তখন আমাদের করায়ত্ত হইবে। আর দেহত্যাগান্তে আত্মার যদি অন্য জগতে প্রস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সমস্ত মৃত আত্মীয়দিগের সহিত যদি সেখানে বাস করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই প্রযুক্ত হে বিচারকবর্গ! মৃত্যুর এই যথার্থ স্বরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হও। আর ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাধু ব্যক্তির ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, মৃত্যু আমার পক্ষে একরূপ মঙ্গলকর বিষয়। এই জন্যই আমার দণ্ডদাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে না। আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি মৃত্যুর পথে যাইতেছি ও তোমরা জীবনের পথে যাইতেছ। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ উৎকৃষ্টতর, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই অবগত আছেন।”

ইহুদীয় ধর্ম্মবেত্তা সলোমনের উক্তি এই —“অজ্ঞানীরাই মৃত ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া মনে করে। কিন্তু মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ অনন্ত অমরত্বের আশার পূর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।” গ্রেগ নামক ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—“মৃত্যুর পর ঈশ্বর আমাদিগকে এমন এক স্বর্গ প্রদান করিবেন, যথায় নির্ম্মল পবিত্রতা ও চিরস্থায়ী স্নেহ বিরাজ করিতেছে। তথায় এরূপ এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ আমরা পাঠার্থ প্রাপ্ত হইব, যাহার পত্রের পর পত্রের আর অন্ত থাকিবে না; এবং যাহা পাঠ করিবার দক্ষতাও সতত আমাদিগের

অনুগামী হইবে। তথায় মহিমান্বিত কার্য্য করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত হইবে; আর সে মহিমান্বিত কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত গুণেরও আমরা অধিকারী হইব। পরলোক এমনি এক স্থান যথায় 'এই জীবন ও মৃত্যুর গভীর সমস্যারও পূরণ হইবে।"

সেলি-নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির উক্তি এই—"হে শোকার্ত্ত! শোক করিতে নিবৃত্ত হও। যে মরিয়াছে মনে করিতেছ, তাহার মৃত্যুও হয় নাই, কিম্বা সে নিদ্রিতও নহে। কেবল মাত্র জীবনের স্বপ্ন হইতে সে জাগরিত হইয়াছে। আমরা (জীবিতেরাই) ঝটিকাময় পার্থিব স্বপ্নের মধ্যে বিলীন হই, তদ্ভূতা ছায়াময়ী মূর্ত্তি সকলের সহিত অলাভকর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছি। সে আমাদের এই পার্থিব নিশীথের ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে। ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, কষ্ট ও অশান্তি তাহাকে আর যন্ত্রণা প্রদান করিতে কিম্বা স্পর্শ করিতে পারিবে না। পার্থিব মালিন্যের সংক্রামতা হইতে সে নিরাপদ হইয়াছে।" অন্যত্র বলিয়াছেন—"জীবন বহুবর্ণবিশিষ্ট কাচপাত্রের ন্যায়। যদবধি মৃত্যু ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলে, ততদিন ইহা আপনাতে প্রতিবিম্বিত অনন্তের শ্বেত রশ্মিসমূহকে আপনার বিচিত্র বর্ণসমূহে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়া থাকে।" মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার ইনিয়াড নামক কাব্যে পরলোকভূমিকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন:—"হে মানব-দৃষ্টির অগোচর পরদেশ ভূমি! তোমার নীরব রাজ্যের গূঢ় রহস্যাত্মক বিস্ময়কর বিষয়ের বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি প্রদান কর।" সেক্সপিয়ার মৃত্যুকে জীবনরূপ অন্ধকারময় মেঘের রাজ্য হইতে আত্মার উত্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুসভ্য জাতিগণের ন্যায় অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও মৃত্যুর পর পরলোক সম্বন্ধে উন্নত বিশ্বাসের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমানগণ তাহাদের পরাজিত গথ, ভেণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে অতি উন্নত মতের প্রাবল্য দর্শন করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন স্পানিয়ার্ডগণ আমেরিকা আবিষ্কার করে, তখন তাহারা আমেরিকার সম্পূর্ণ নগ্নকায় অসভ্যগণের মুখে আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে অকপট বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আফ্রিকার অতি অসভ্য বন্যগণকে কেহ মানুষের আত্মা আছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এই উত্তর প্রদান করিয়াছিল—"এই বিশাল জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এ তত্ত্ব যেরূপ অখণ্ড সত্য, মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে, তাহাও তেমনি নিঃসন্দেহ বিশ্বসনীয়।"

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

করমেতিবাই।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন, "ভক্তিই মানবের সার সম্পত্তি।" রমণীর হৃদয় মায়ার আধার হইলেও যখন ভক্তির ভাবে উন্মাদিত হয়, তখন তাঁহারা মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারিণী হইতে কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখের আশায় জলাঞ্জলি দেন, ভাল খাইব কি ভাল পরিব এবম্বিধ চিন্তায় ব্যাকুল হন না। শ্রীহরিই একমাত্র বস্তু, আর সকল অবস্তু জ্ঞানে তাঁহার আরাধনাকেই তাঁহারা জীবনের ব্রত করেন। ভারতবর্ষে যে সকল মহিলা সাধুজনানুমোদিত জীবন যাপনপূর্ব্বক ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, করমেতিবাই তাঁহাদিগের অন্যতমা।

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত খজেল গ্রামে পরশুরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রাজ-পুরোহিত ছিলেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠা-পরায়ণ ও বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। করমেতিবাই তাঁহারই কন্যা। বাল্যকালে তিনি স্বসম্প্রদায়সম্মত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পিতার নিকট পাঠ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পিতার ধর্ম্মানুপ্রাণিত মধুর জীবন দর্শনে জীবনের উষাকালেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর জন্মিল।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "কাশীর দিকে যত অগ্রসর হইবে, কলিকাতা তত পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে—পূর্ব্ব দিকে যতই যাবে, পশ্চিম দিক্ ততই দূরবর্ত্তী হ'বে—ভগবানের দিকে যতই এগুবে, সংসারাসক্তি ততই কমিয়া আসিবে।" যৌবনাগমে সাধারণ মানবগণ ভোগলিপ্সু হইয়া থাকে। তাহাদের মন তখন বাহ্য বস্তু ও বাহ্য ব্যাপারেই আসক্ত হইবে। করমেতিবাই বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরাগিণী। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহার ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। যৌবনে পদার্পণ করিলে সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি বাহ্যবস্তু লইয়া মত্ত হইলেন না। হরিকথায়, হরিচিন্তায়, হরিগুণগানে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। হরিই তাঁহার মনঃপ্রাণ অধিকার করিলেন। সংসারে ধন ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। পূর্ণানন্দময়ের চরণলাভের জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কন্যার এই ভাব দর্শনে পিতামাতার হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিল। সংসারী করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা করিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব কিন্তু বুঝে না যে, দীনবন্ধু হরি যাঁহার সংসার বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকে আবার সংসারে আবদ্ধ করিবে কে? কিয়ৎকালের পর তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে

লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। সংসারে মজিলে তিনি সে ধন পাইবেন না যাহার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল, এই ভাবিয়া তিনি স্বামিগৃহে যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। ভগ্নমনোরথ হইয়া ভৃত্যেরা ফিরিয়া গেল।

ঈশা বলিয়াছেন, "যে চায় সেই পায়।" গীতায় আছে, সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া যে শ্রীভগবানের শরণাগত হয়, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যেখানে প্রাণের ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা, এবং অনুরাগের ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হয়, সেইখানেই ভগবান্ সহজ-লভ্য হন। প্রাণের টান, হৃদয়ের আবেগ এবং অন্তরের প্রেম না থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। পিত্রালয়ে ভগবদারাধনা করিতে করিতে করমেতি-বাই ভগবানের প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুরাগের ঐকান্তিকতা জন্মিলে তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবন-গমনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহাকে কে যেন বলিল—"আর না, এই সময়।" সেই অলক্ষিত মর্ম্মস্পর্শী দৈববাণী তাঁহার প্রাণকে আকুল করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুকোমল শয্যা কণ্টকসম বোধ হইল। শ্রীহরির চরণবন্দনাপূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বহির্দ্বারের নিকট গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। অনন্যোপায় হইয়া তিনি সকাতরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গৃহের ছাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি-দানও দৃষ্ট হয়। ভগবান্ অনুরাগী ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাহাকে বিপদ আপদ হইতে মুক্ত করেন। প্রহ্লাদ অনলে, সাগরজলে, হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইলেও, বিষভক্ষণ করিলেও শ্রীহরির কৃপায় সর্ব্ববিপন্মুক্ত হইলেন। ভগবৎ-প্রসাদে অগ্নির দাহিকা শক্তি লুপ্ত হইল; বিষ অমৃতে পরিণত হইল; সাগরজলে তিনি ভাসমান হইলেন; হলাহল নিষ্ফল হইল। করমেতিবাই অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। তিনি দুঃখস্পর্শের অনধিগম্যা হইলেন। তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গম ছিল—প্রশস্ত রাজপথ ছিল না—রেলরোড ছিল না। স্থানে স্থানে হিংস্রজন্তুপূর্ণ গভীর অরণ্য বিদ্যমান ছিল। একে অবলা ও কুলবালা, তাহাতে বৃন্দাবনের পথ দেখায় এরূপ লোকও তাঁহার কেহ ছিল না; সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বলও ছিল না। এইরূপ অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বৃন্দাবনাভিমুখিনী হইলেন।

প্রভাত হইলে এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, করমেতিবাই কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। পরশুরামের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এ কথা যে শুনিল, সে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পরশুরাম রাজার নিকট গিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে রাজা অবিলম্বে তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

এদিকে করমেতিবাই একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত কতিপয় রাজানুচরকে প্রান্তরের অপর পার্শ্ব দিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি একটী মৃত উষ্ট্রের গলিত শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। তিনি উষ্ট্রগর্ভে তিন দিন যাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বহুকষ্টে অনেক দিনের পর বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন। তথায় সাধুসঙ্গে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড-তীরস্থিত বনমধ্যে ভগবানের ধ্যানারাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। যাঁহার গৃহে ভোগ্যবস্তুর অভাব ছিল না, তিনি ভূমি-শয্যা সার করিলেন; স্বভাবজাত ফল মূল তাঁহার খাদ্য হইল। স্বর্গীয় বল যখন মনুষ্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন তাহার এইরূপ ভাবান্তর হইয়া থাকে। রাজার ছেলে বুদ্ধদেবকে এবং শচীনন্দন নিমাইকে কে বৈরাগী করিল? নরহন্তা সলকে কে সর্ব্বত্যাগী ও ঈশার পদানত করিল? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা কিসের জন্য সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইলেন? হা ধর্ম্ম! তোমার কি মোহিনী শক্তি!!!

চতুর্দ্দিকে প্রেরিত রাজানুচরেরা করমেতিকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরশুরাম আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে পৌছিলেন। তথায় তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না। একদিন তিনি একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষশিরে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরস্থিতা ধ্যানমগ্না কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, অশ্রুধারা তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীহরির ধ্যানে তিনি নিমগ্না!! তাঁহার এই ভাব দর্শনে পরশুরাম তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে করমেতিবাই সমীপবর্ত্তী পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে আনিতে পারিলেন না। তাঁহার কাকুতি মিনতি অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল।

পরশুরাম গৃহ-প্রত্যাগত হইলে রাজা তাঁহার নিকট করমেতিবাইর মহাভাব ও বৈরাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অবিলম্বে বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় করমেতি-বাইকে দেখিয়া তিনি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। দীনতার প্রতি-মূর্ত্তি করমেতিবাইও রাজার প্রতি যথা-যোগ্য ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বাসোপযোগী কোন গৃহ নাই

দেখিয়া রাজা তাঁহার জন্য একটী গৃহ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলে করমেতিবাই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাসগৃহে আমার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা নির্ম্মাণ করিতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিনষ্ট হইতে পারে।" রাজা অনেক অনুরোধ করাতে করমেতি শেষে তাঁহার প্রস্তাবে মত দিলেন। তাঁহার অনুমতি পাইয়া রাজা বৃন্দাবনে তাঁহার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মানবচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী বিজন বনমধ্য-স্থিত সেই নিভৃত কুটীরে তিনি ভগবানের প্রেমে নিমগ্ন হইলেন।

বে প্রেমুসে না মিলে নন্দলালা—প্রেম ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হয় না। সেই মধুর মধুর মধুর—অতি মধুর, অতি পবিত্র ও অতি সুন্দর প্রেমের প্রভাবে প্রেমিকা করমেতি-বাইর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তাঁহার হৃদয় বিমলানন্দে পরিপ্লুত হইল। প্রেমাঞ্জ-রঞ্জিত দিব্যচক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তিনি দেখিলেন যে, প্রেমাধার হরি বাহ্যজগতে বিরাজমান—তরুতলায়, চন্দ্রতারকায়, ফলফুলে, পাহাড়ে ও নদীতে বিশ্বরূপী নারায়ণ বিদ্যমান। আবার চক্ষু নিমীলন করিয়া তিনি অন্তরের অন্তরে তাঁহারই প্রকাশ অনুভব করিলেন। গীতায় আছে ঃ—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

করমেতিবাই এইরূপ গভীর আধ্যাত্মিক প্রেমযোগে যুক্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে হরিদর্শন করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করিলেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৮)

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য আর সংসারে মুহ্যমান হয় না। যিনি চরমকালেও এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানাচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-শিক্ষার্থী অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলিলেন যে, যখন তুমি সমাধিস্থ হইয়া অটল ভাবে পরমেশ্বরে স্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগফল—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া অর্জ্জুন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তাহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি সপ্তদশটী শ্লোকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এক্ষণে উপরি-উক্ত

মহাবাক্যে তাঁহার উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মী স্থিতি যোগীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাই প্রার্থনীয়। সকল ধর্ম্মাচার্য্য ভিন্ন ভিন্নভাবে এই অবস্থাটী আদর্শরূপে শিষ্যদিগের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট "নির্ব্বাণ," মহর্ষি ঈশার 'self-surrender." আত্মসমর্পণ, যাহাতে পিতা পুত্রের একত্ব, শ্রীচৈতন্তের "যুগলমিলন" এবং প্রাচীন ঋষিদিগের আত্মা ও পরমাত্মার গাঢ় যোগে "অধ্যাত্মযোগ." এসকলই এক কথা। জীব যখন এই ব্রাহ্মী স্থিতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সে তন্ময় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী; ব্রহ্মপ্রেমে পরিপূর্ণ এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হয়। ব্রহ্মশক্তি মানব-আত্মাতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সে আত্মহারা হইয়া যায়। এইরূপ দেবভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয় মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত এবং তাঁহার আনন্দ-সুধারস-পানে নিরত। সংসারের ক্ষুদ্র ধন মান সুখসম্পদ তাহার নিকট তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য; সুতরাং তাহারা তাহাতে আকৃষ্ট বা বিমুগ্ধ করিতে পারে না। যাহারা নিত্য সত্য ভূমানন্দ পরমেশ্বরকে আপনাদিগের নির্ভরস্থানরূপে প্রাপ্ত হয় না, তাহারাই সংসারের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং ইহার ক্ষুদ্র অসার মলিন কামনার দাস হইয়া মোহমায়ায় জড়িত হয়। তাহারা দুঃখ হইতে কঠিনতর দুঃখে, অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকারে, ভয় হইতে মহাভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যিনি মনোগত সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সংসারের সুখ দুঃখ, শুভাশুভ যাঁহার নিকট সমান, যিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও পরম সংযমী, যিনি আত্মজয়ী, দেবপ্রসাদে যিনি সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার এবং পরমাত্মাকে লইয়া যিনি আত্মসন্তুষ্ট, এরূপ ব্যক্তির মোহে মুহ্যমান হইবার সম্ভাবনা কি?

ব্রহ্মযোগ প্রথম বয়স হইতেই সাধনীয়। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী, তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করেন এবং সুশিক্ষা, সাধুসঙ্গ ও তপস্যার দ্বারা পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান অভ্যাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকৃপা তাঁহাদের সহায় হইয়া অচিরে তাঁহাদিগকে সিদ্ধমনোরথ করে। তাঁহারা ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া জীবনকে ধর্ম্মের জীবন এবং সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিয়া চিরদিন পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করেন এবং মরণকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত, ইহকাল ও পরকাল তাঁহাদিগের নিকটে তুল্যানুতুল্য। কিন্তু ঈশ্বরের অপার ও আশ্চর্য্য কৃপা, ইহাতে কাহারও নিরাশ হইবার কথা নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদিগের বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা বিফলে বা পাপের সেবায় গত হইয়াছে, তাহারাও বৃদ্ধবয়সে যদি অনুতপ্ত হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত

ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দয়াময় পরমেশ্বর তাহাদিগের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকেও চরণাশ্রয় দান করেন। ব্রহ্ম-কৃপাগুণে যুগে যুগে কত জগাই মাধাই এইরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। একটী প্রবাদবাক্য আছে—"তপ কর জপ কর মর্‌তে জান্‌লে হয়।" মানুষ মৃত্যুকালে যদি সমুদায় সংসার-মায়া ভুলিয়া তদ্গত-চিত্ত হইতে পারে, তাহাতেই সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য গীতার উপদেষ্টা এই পরম আশাকর বাক্য বলিয়া যোগা-ধ্যায় শেষ করিতেছেন যে, অন্তকালেও এই ব্রহ্মস্থিতির অবস্থা হইলে, তাহাতেই জীবের মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইবে।

পাশ্চাত্য গ্রাম্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

(৪৮৩ সংখ্যা—২১৮ পৃষ্ঠার পর)।

একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে—লোকে যে পরিমাণে সভ্যতা ভব্যতা শিখে, সেই পরিমাণে কবিত্বহীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা কবিতার বিষয় আন্দোলন করেন বটে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কষ্ট-কল্পনায় ও অসাধারণ বাগ্-বৈচিত্র্যে তাঁহা-দিগের পুস্তকগত ভাব ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে চাহেন। সহরের ইংরাজদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় শীতল বাহ্যাড়ম্বর অতি অল্প দেখা যায়। একটী শোক-পরায়ণতার বাহ্য দল গঠন করা হয়। শোকসূচক গাড়ী, শোকসূচক ঘোড়া, শোকব্যঞ্জক পালক, ভাড়া-করা শোক-কারী লোক ইত্যাদি সকলই থাকে, বোধ হয় যেন শোককে সকলে মিলিয়া বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছে। "একটী কবর খনন করা হইয়াছে"—জেরেমি টেলার (Jeremy Taylor) বলেন, "সুতরাং গভীর শোকো-চ্ছ্বাস উঠিয়াছে, পাড়ায় পাড়ায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দিনকত গত হইলে তাহারা কখনও—আর কখনও এ পরলোকগত ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করিবে না।" হর্ষ-কোলাহলপূর্ণ নগরে শীঘ্রই আমরা পূর্ব্বতন সঙ্গীদিগের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই। নূতন নূতন লোকের নিত্য আমদানী, এবং নিত্য নূতন নূতন আমোদরাশি তাহার স্মৃতিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলে এবং পরস্পর-শৃঙ্খলিত স্মৃতি-উদ্দীপক দৃশ্য ও সঙ্গিসমূহও নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গভীর ভাবে চিত্তাকর্ষণ করে। মৃত্যুর কুঠার গ্রামের চতুর্দ্দিকে একটু বেশী স্থানে আঘাত বিস্তারিত করে এবং গ্রাম্য জীবনের শান্তিময় একতার মধ্যে এক-জনের মৃত্যুঘটনা একটী লোমহর্ষণ ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবিশ্রান্ত শব্দায়-মান সমাধি-ঘণ্টাধ্বনি প্রতিকর্ণে বাজিয়া

উঠে; দিগন্তব্যাপী শোক পর্ব্বতকন্দর ও উপত্যকাপথ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে এবং সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে বিষাদ ঢালিয়া দেয়।

পল্লীগ্রামে এরূপ ঘটনা স্বাভাবিক। মৃত ব্যক্তি যে চিরপরিচিত পথগুলির সাথী ছিল, সে পথে তাহারই কথা মনে হয় এবং প্রত্যেক নির্জ্জন দৃশ্য—প্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বজাগরিত প্রতিধ্বনিতে তাহার স্বর শুনিতে পাই, তাহার চিরবিহরিত কুঞ্জমধ্যে যেন তাহারই নিশ্বাস-ধ্বনি পাই। কাননমধ্যস্থ উচ্চভূমিতে বসিয়া কিংবা উপত্যকাপথের সৌন্দর্য্যরাশির ভিতর থাকিয়া তাহার বিষয় চিন্তা করি। আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল প্রভাতের সজীবতায় তাহার প্রভাময় হাস্য ও অপরিসীম হর্ষ দেখিতে পাই; এবং যখন শান্তিময়ী সন্ধ্যা তাহার সঞ্চিত ছায়ারাশি ও গভীর নিস্তব্ধতা ঘনীভূত করিতে থাকে, তখন কত সময়ের বিশ্রব্ধালাপ ও অনুরক্ত হৃদয়ের বিষণ্ণতার কথা স্মৃতিপথে আসিয়া ক্ষণেকের তরে আঁধার হৃদয়ে বিজলি বিকাশ করে।

বাসভূমি হবে প্রতি নিরজন স্থান,
অশ্রুরাশি বরিষণ হবে নিয়মিত;
ভালবাসি, যতদিন রবে দেহে প্রাণ,
কাঁদি তবে, যতক্ষণে করুণামূর্চ্ছিত।

পল্লীগ্রামে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি বহুদিন জাগরিত থাকিবার আর একটী কারণ এই যে, বিয়োগবিধুর ব্যক্তিদিগের ঠিক চক্ষের উপর প্রিয়জনের সমাধিগুলি বিরাজিত থাকে। উপাসনা করিতে যাইবার সময় এই সমাধিগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; পারত্রিক কার্য্যানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন হৃদয় কোমল হইয়া উঠে, তখনও তাহারা চক্ষের উপর ভাসে। রবিবারে যখন চিত্ত পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে এবং বর্ত্তমান আমোদ প্রমোদ ও স্নেহভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতীতের গম্ভীর চিন্তায় রত হয়, তখনও সমাধিগুলি চক্ষের উপর দেখিতে পাই। উত্তর ওয়েলসের (North Wales) কৃষকেরা ঐ দারুণ দুর্ঘটনার পর হইতে কয়েক রবিবার তাহাদিগের মৃত পরিজনের সমাধিস্থানের উপর নতজানু হইয়া উপাসনা করে। যে সকল স্থানে পুষ্প বর্ষণ ও পুষ্প বৃক্ষ রোপণের সুন্দর অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, ইষ্টার, হুইটস্যানটাইড এবং অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে যখন নূতন ভাবে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়েই ঋতুরাজ আপনার গত জীবনের সঙ্গীটির কথা মনোমধ্যে উজ্জ্বলরূপে জাগাইয়া দেয়। খুব নিকটস্থ কুটুম্ব ও সুহৃদ্‌ দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়, কোনও ভৃত্য, নীচ অথবা অর্থলোভী ব্যক্তি নিযুক্ত হয় না। এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিবেশীর সাহায্য লইতে হইলেও লোকে অপমানকর বোধ করে।

এই সুন্দর গ্রাম্য অনুষ্ঠানটীর উপর প্রবন্ধ লিখিবার কারণ এই যে, ইহা প্রণয়ের একটী পবিত্র সম্মানসূচক শেষ

নিদর্শন। শ্মশান প্রকৃত ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা-স্থল। এইখানেই পাশব অনুরাগের স্বাভাবিক উত্তেজনার উপর মানবের স্বর্গীয় প্রেমের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। প্রথমোক্তটী কেবল আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের অবিচ্ছেদ উপস্থিতিতে সজীব রাখিতে পারা যায় না; কিন্তু যে প্রেম প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছে, তাহা দীর্ঘ স্মৃতির উপর জীবিত থাকে। যে সৌন্দর্য্যরাশি নয়নকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার অপগমে ইন্দ্রিয়াসক্তি অবসন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং সমাধিপ্রস্তরের বীভৎস সীমা হইতে উহা দারুণ বিরক্তির সহিত ফিরিয়া আইসে। কিন্তু প্রকৃত ও পবিত্র প্রেম শ্মশান হইতে পূত হইয়া একটী স্বর্গীয় অগ্নিশিখার ন্যায় শোকবিধুর ব্যক্তিদিগের হৃদয় পবিত্র ও আলোকিত করিতে থাকে।

স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে।*

নিষ্ঠাবতি,

আমি এই সন্ন্যাসভূমি কাটোয়ায় আর তুমি কোথায়? বিশ্বাসবলে তুমিও সন্ন্যাসিনী সাজিয়া আমার নিকটে। বিজ্ঞান বলে ও দিকের খবর আমরা কি জানি, অমর আত্মা কোথায় থাকিবে, দেশ কালকে অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা, এ সকল চিন্তা বৃথা। অজ্ঞেয় যাহা, তাহা চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। এ কথা সত্য নয়। ভগবানের মত অজ্ঞেয় কি, তিনিও বিশ্বাসীর অতি নিকটে, তাঁহার কোলে আশ্রয় লওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি শ্রবণ করি; আমি বলি, তিনি শ্রবণ করেন। যেন সমুদয় জড় জগৎ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ। এ সকল প্রতীয়মান হয় প্রকৃত বিশ্বাসের সাধনায়। অন্যের কি হয় তাহা বলিতে পারি না, আমার সঙ্গে বিশ্বাস আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইল, উজ্জল হইল, সন্দেহ দূরে গেল। এখন যদি কেহ বলে যে তোমার ঈশ্বর অজ্ঞেয়, কিনা অবতার না হইলে, ঈশ্বর-দর্শন কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে মনে মনে বলিয়া ফেলি, প্রভু ক্ষমা কর, ইহারা জানে না ইহারা কি বলিতেছে। যখন দেখিতেছি যে এমন অজ্ঞেয় পুরুষ, পরম-জ্ঞেয় ও সহজ হইলেন, তখন জ্ঞেয় আত্মা, কেন বিশ্বাসীর নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে তাহা জানি না। কিন্তু তপস্যা আবশ্যক, তোমার মত নিষ্ঠা প্রয়োজন। এখন তোমার নিষ্ঠার কথা একবার বলি। ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সাল প্রাতঃকালে উপাসনার আয়োজন হইল। আচার্য্যের

* স্বর্গগতা শ্রীমতী অঘোরকামিনীর উদ্দেশে তাঁহার স্বামী কতকগুলি পত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই অন্যতম। বা, বো, স।

স্বর্গারোহণ-দিন প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারীতে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা, হবিষ্যান্ন আহার, নিজেও করিবে, আমারও সহায়তা করিবে। কেন, ঐ দিনে নিষ্ঠার কারণ কি? কেশবচন্দ্র কে, যে তাহার জন্য ৮ই জানুয়ারী এত নিষ্ঠার প্রয়োজন? তোমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছিল, মৃদু মন্দ হাসিয়া সেই যে তিনি বলিলেন, আর কি ভুলিতে পারিব? এ কথাগুলি তোমার প্রাণে বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি ভুলিতে পারেন না, আর তুমি কিরূপে ভুলিবে? সামান্য আত্মীয়ার জন্য বৎসর বৎসর লোকে কত কি করিয়া থাকে, আর এমন উপকারী বন্ধুকে বৎসরান্তে মায়ের কোলে দর্শন করা তোমার নিকট অধিক কি হইল? শেষ রাত্রিতে মাতৃস্তোত্র পাঠ হইল, নামগান করা হইল, অতি প্রত্যূষে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় উ-বাবু মহাশয় বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। বাহিরে কেন বসিলেন জানি না, বোধ হয় তোমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না সেই জন্য। আহারের সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি ধরিয়া বসিলেন, হবিষ্যান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং তোমার নিজের অংশ হইতে তাঁহাকে আহার করাইলে এবং জন্মের মত আত্মীয় করিয়া লইলে। আমি জানিতাম না যে তিনি তোমাকে এত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তোমার স্বর্গারোহণের পর উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বামাবোধিনীতে তোমার বিষয় যেরূপ সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এটী তোমার সেই এক দিনের নিষ্ঠার গুণে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক যখন হরিগুণ গান করিলে, সকলেই যোগদান করিয়া সুখী হইল। উপাসনার গৃহে সকলেরই স্থান হইত, ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম ধর্ম্মপিপাসু হইলেই হইল। উপাসনার গৃহে অবগুণ্ঠন ছিল না। যাহার অত্যন্ত কুদৃষ্টি, সেও স্থান পাইত। তোমার বিশ্বাস ছিল উপাসনার গৃহ এত উচ্চ স্থান, এখানে কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে না। তবে যাহারা চঞ্চল, তাহাদের লজ্জা রক্ষার্থে স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে। এইরূপে ১২ই জানুয়ারী মাইজী ও মহারাজ উপাসনায় যোগ দিলেন। ইহারা হিমাচলবাসী নেপালরাজ্যের লোক। মতিহারীতে ইঁহাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ইঁহারা উচ্চ শৈবধর্ম্মাবলম্বী, গীতা পাঠ করিতেন, আহার বিচার করিতেন না, জাতি মানিতেন না। ইঁহাদের বড় মিষ্ট স্বভাব ছিল। মাইজী মহারাজের শিষ্য নহেন, মহারাজ তাঁহার গুরু ভাই, কিন্তু গুরু মহারাজের হুকুম ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। মহারাজ উপাসনা শুনিয়া বলিলেন, "হোতা", "হোতা"। এ কথা দুটীর অর্থ তুমি বুঝিলে। ইহা আশ্বাস-বাণী, "হবে", "হবে" কোন শৈব কোন ব্রাহ্মকে বলিতে পারে কিনা জানি না।

তোমার নিষ্ঠার সুখ্যাতি এই সময় ছুটিয়াছিল। কোথায় হিমাচল, কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় উড়িষ্যা, রেলপথে যাইতে হইলেই বাঁকীপুরে অনেকেই এক বার থাকিয়া যাইতেন। ১৪ই জানয়ারি ১৮৮৯ সদাসিও রাম ও লছমন প্রসাদ তোমার গৃহে অতিথি হইলেন। উপাসনার আয়োজন হইল, লছমন প্রসাদ উপাসনা করিলেন। ঐ সময় লছমন প্রসাদ ভদ্র পোষাকের বিষয় একটী জীবনকাহিনী বলিলেন। প্রচারক হইবার পূর্ব্বে তিনি মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিতেন, এক সময়ে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সিপাহীর বেশে হ্যাঙ্গার ঝুলাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনের জমাদার তাঁহাকে প্লাটফরমে যাইতে দিল না। এখনও সময় হয় নাই, এখনও কালা আদমীর প্রবেশাধিকার নাই। একটু পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিলাতী পোষাকে সুসজ্জিতা হইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন ও নিজ স্বামী মহাশয়কেও ডাকিয়া লইলেন। এটী পোষাকের গুণ—এখানে চলে, ধর্ম্মজগতে নিষ্ঠার আধিপত্য। যাঁহার নিষ্ঠা আছে, তাঁহার সর্ব্বত্রই গতিবিধি। ভরসা হয় যে, তোমার নিষ্ঠায় আমারও স্বর্গ প্রবেশে অধিকার জন্মিয়াছে। হে নিষ্ঠাবতি! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও যেন আমার নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্য।

গার্হস্থ্য আশ্রমের নিকট সকল আশ্রমবাসিগণ (অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ভিক্ষু প্রভৃতি) উপকৃত হইয়া থাকেন। এইজন্যই সর্ব্ববিধ আশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ। সমগ্র মানবের হিতসাধনই এ আশ্রমের প্রধানতম কর্ত্তব্য—ইহা জীবনের মহাশিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান।

নারীহৃদয় স্বভাবতঃ করুণা ও মমতার আধার স্বরূপ। সংসারে কোমলতর বৃত্তিগুলি অর্থাৎ দয়া, প্রীতি, স্নেহ, পবিত্রতা, প্রেম প্রভৃতির বিকাশ করিয়া গুরুজনবর্গের সেবা এবং সন্তানগণকে সদ্‌ভাবে পরিচালিত করিয়া, তাহাদিগের হৃদয় উচ্চ আদর্শে পূর্ণ করিয়া, সংসারে ও সমাজে অমৃতস্রোত প্রবাহিত করাই গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্ত্তব্য। পতিগৃহগমনোন্মুখা শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্ব উপদেশ দিতেছেন,—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নী জনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী

যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুল-
ব্যাধয়ঃ॥

অর্থাৎ গুরুজনের সেবা ও সপত্নীদিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিবে, পতিকর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও তাঁহার হিতসাধনে বিরত হইবে না, সংসারে সর্ব্বথা উদারতা প্রকাশ করিবে, সুখসম্পদে গর্ব্বিতা হইবে না, এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিলে রমণীগণ সুগৃহিণী-পদের যোগ্য হন, নতুবা তাঁহারা কুলের কণ্টক স্বরূপ হন।

মহর্ষীর এই অমূল্য উপদেশাবলী রমণী-জীবনে প্রতিপালিত হইলে সংসারে কোনরূপ অশান্তির উদ্ভব হইতে পারিবে না। বলিতে পার ইহা পুরুষ জাতির স্বার্থসাধনের পরিচায়ক—কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঠিক্ তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ এই নিয়ম কেবল আইনের বাঁধ নহে, সংসারে সুখলাভের ইহা মুখ্য উপায়। তাই বলিয়া কেবল মাত্র ঐ কয়টী বৃত্তির অনুশীলনেই নারীজীবন যাপিত হইতে দেওয়া সমাজের উচিত নহে। ঐ সকল কর্ত্তব্যসাধন নারী-জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু চরম সীমা নহে; তাহাদিগকে আরও উচ্চ অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যতদিন তাহারা সে উচ্চতা প্রাপ্ত না হইবে, তত দিন সমাজে অধিকতর সুসন্তান লাভের সম্ভাবনা নাই। পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির শক্তির বহু প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের আত্মার অনুশীলনে অধিকার নাই, তাহারা কেবলমাত্র পুরুষ-জাতির ক্রীড়নক বিশেষ হইয়া থাকিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, নারীজাতি জ্ঞান-রাজ্যের পবিত্র প্রকোষ্ঠে কত দূর নীত হইয়াছিলেন। কি শাস্ত্র, কি কাব্য, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই রমণীগণের অপরিসীম প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ তাঁহাদের পতিনিষ্ঠতা, গুরুজনভক্তি, সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আধুনিক রমণী-দিগকে দর্প করিয়া দেখাইবার সামগ্রী। তাঁহাদিগের আত্মা সম্যক্রূপ অনুশীলিত হইত বলিয়াই—তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও জীবনকে এরূপ মধুময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

রমণীহৃদয় বড়ই বেগশালী, ইহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত। সেই বেগবত্তা যে দিকে পরিচালিত করা যায়, সেই দিকেই তীব্র ভাবে নিয়োজিত হয়। ভাল দিকে দাও, অমৃতময় ফল ফলিবে—মন্দ দিকে দাও অধোগতির চরম সীমায় নীত হইবে। তাহারা সুশিক্ষিতা হইলে সংসার শান্তিময় হইবে—রমণীর তেজস্বিতা, রমণীর একাগ্রতা সংসারকে বহু পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। নারীজাতিকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ত্রুটি ঘটে। নারী জাতির শিক্ষাহীনতাই যাঁহারা সংসারের সুখ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত—তাঁহারা নিজেদের এবং ভাবী বংশধরগণের সুখের পথে কণ্টক রোপণ করেন মাত্র, কারণ

নারী জাতি অশিক্ষিতা হইলে তদীয় সংসর্গে সুশীল স্বামীও দুঃশীল হইয়া পড়েন; পুত্র মাতৃহস্তেই গঠিত, কিন্তু উচ্চ আদর্শের অভাবে তাঁহাদের চরিত্র বিকৃত হয়—গৃহের অন্যান্য সহযাত্রিগণ অধঃপতিত হন। রমণীরা যতই জ্ঞানরাজ্যে আরূঢ় হইতে পারিবেন, সংসারও ততই উন্নত হইবে। প্রত্যেক সংসার উন্নত হইলেই—সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে রমণী জাতি গৃহিণী ও জননী, সে জাতিকে কদাচ অশিক্ষিত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সংসারে গুরুজনবর্গের সেবা, দাসদাসী প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার প্রভৃতি কার্য্যের সহিত স্বীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা এবং নিয়মিতরূপে আত্মার অনুশীলন করা নারী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংসারের সমাজের ইষ্টানিষ্ট গভীর ভাবে অনুভব করিয়া কবিতা বা চিত্রাদির সংযোগে তাহা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া সমাজের সমক্ষে উপনীত করিয়া সমাজকে উন্নতিপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করা রমণীর উচিত। রমণীহৃদয় স্বতই শিল্প-ময়—রীতিমত সেই প্রবৃত্তির অনুশীলন করিলে ভারতে এক নবীন যুগ উপস্থিত হইতে পারে, ভারত আবার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে। রমণীগণ কেবল আহার নিদ্রা, রাঁধা বাড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিলে অথবা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চাকরী করিতে ছুটিলে সমাজের উন্নতি হইবে না। তাহাদের আত্মার অনুশীলন, সেবাসুরক্তি, কঠোর সংযম, আত্মত্যাগ, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। নারীজীবন এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও তাঁহাদের গৌরবে সমাজ উজ্জ্বল হইবে। নারীজাতির এই অমূল্য গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণে সং-ক্রামিত হইয়া সংসারে অমৃতস্রোত বহিয়া যাইবে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

"বঙ্গ দ্বিধা হও।"

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা রাজপুরুষ লর্ড কর্জন মন্ত্রসভায় অনেক দিন স্থির করিয়া-ছিলেন বঙ্গদেশকে ছেদন করিয়া দুই খণ্ড করিতে হইবে—পূর্ব্ব বঙ্গ আসাম-ভুক্ত হইবে, পশ্চিম বঙ্গ মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন উপবিভাগ লইয়া বর্দ্ধিত-কলেবর হইবে। যুক্তি এই—বঙ্গদেশ যেরূপ বৃহদাকার ও বহুসংখ্যক প্রজার বাসস্থান হইয়াছে তাহাতে ইহার শাসন একজন শাসনকর্ত্তার অসাধ্য, দুইজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহার দুই ভাগের উপর কর্তৃত্ব করিলে সর্ব্ববিধায় সুবিধা হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের কলেবর বর্দ্ধিত

করা হয়, তাহাতে শ্রীহট্টবাসীরা যে অধিক সন্তোষ বা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বোধ হয় না। তৎপরে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যোড়া দিবার কথা হয়; ইহাতে চট্টগ্রামবাসীরা প্রতিবাদী হন এবং আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনর ও তৎকালীন হাইকোর্টের জজেরা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহার অবৈধতা প্রতিপন্ন করেন। কেহ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বর্ত্তমান শাসনকালে সেই প্রস্তাব হইয়াছে; কেবল চট্টগ্রাম নয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং আবশ্যক হইলে বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাও আসামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই রাজমন্ত্রণা প্রচার হওয়া অবধি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বস্থানে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উঠিয়াছে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এ সম্বন্ধে তারের খবরে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বড় লাট এই আন্দোলনের বাড়াবাড়ি দেখিয়া স্বয়ং দলবলসহ চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ পরিদর্শনে যান এবং গোলযোগের শান্তি করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু দেশবাসীরা বলিতেছেন "দোহাই রাজন্, দোহাই ধর্ম্ম, আমাদিগকে বিভক্ত করিবেন না, তাহাতে আমাদের সকল বিষয়ে ক্লেশ ও অমঙ্গল হইবে।" রাজপ্রতিনিধি তারস্বরে বলিতেছেন, "এ অবুঝের কথা। বঙ্গ দ্বিধা হও, আমি সব জানিয়া শুনিয়া বলিতেছি ইহাতে তোমার সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি ও মঙ্গল হইবে।" রাজপুরুষের বাক্যে দ্বিধা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আর বাক্যে তর্কবিতর্ক, ক্রন্দন বা আন্দোলন করিয়া কি হইবে? কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, বড় শাসনকর্ত্তা বঙ্গকে দ্বিখণ্ড কেন, শতখণ্ড করিলেও তাঁহার ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রতিরোধ করা কি দেশবাসীদের সাধ্য? আমাদের বড়লাটের উপর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি দেশবাসীদের মনোভাব ও স্বার্থ বুঝিয়া প্রতিবিধান করেন ত রক্ষা, নচেৎ বঙ্গ নিরুপায়।

রুষ-জাপান যুদ্ধ।

রুষিয়া বহুদিন; সাইবিরিয়া অর্থাৎ তাহার আসিয়াস্থ রাজ্যকে বিস্তারিত করিয়া ক্রমে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছেন। তাহার প্রসার এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট রুসিয়া ও ইংলণ্ডের আধিপত্যের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে বাধ্য হন। রুষ তাতার, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি অধিকার করিয়া অবশেষে চিনের সাম্রাজ্যভুক্ত মেঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হন। মেঞ্চুরিয়া তাঁহার করতলগত হইয়াছে এবং সাইবিরিয়া হইতে রেলওয়ে

তাহার উপর বিস্তারিত হইয়াছে। কোরিয়া লইয়া জাপান ও রুষে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহারাই পরিণাম বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ।

তিন চারি মাস ধরিয়া জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু রুষিয়া কোরিয়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন এবং জাপান কখনও তাহা করিতে দিবেন না, এই সহজ প্রশ্ন মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। রুষিয়া আসল কথা ছাড়িয়া নানা স্তোক-বাক্যে জাপানকে শান্ত করিবার প্রয়াসী হন এবং একদিকে স্পষ্ট উত্তর দেন না, অন্যদিকে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। জাপান আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া গত ৮ই জানুয়ারি রাত্রিকালে নৌ-সৈন্য লইয়া রুষিয়ার পোর্ট আর্থর হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং তাহার বড় বড় জাহাজ ভগ্ন বা জলমগ্ন করিয়াছেন। বেডিবষ্টকের নৌযুদ্ধেও রুষিয়া পরাস্ত হন। ইহার ফলে রুষিয়ার নৌবল নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। রুষীয় শাসনকর্ত্তা আলেকসিয়া আর্থর বন্দর পরিত্যাগ করিয়া ৩০০ মাইল দূরে হার্ব্বিন বন্দরে আড্ডা করিয়াছেন, জাপানীরা কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিয়া স্থলযুদ্ধের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমরে উভয় পক্ষ কতক কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঠিক্ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, জাপান ও তাহার সপক্ষ জাতিরা জাপানের বাহাদুরীর প্রশংসা ও রুষিয়ার কাপুরুষতার গ্লানি করিতেছেন। রুষিয়া ও তাহার পক্ষীয়েরা অন্যরূপ বলিতেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানের বন্ধু, ফ্রান্স রুষিয়ার বন্ধু। অন্যান্য জাতি কতক এদিক, কতক ওদিক অথবা স্পষ্টভাবে কিছু ধরা দিতেছেন না। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে, জাপান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, রুষিয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করেন, ইহাতে রুষিয়ার ক্ষতি অধিক ও জাপানের অল্প হইয়াছে। জাপানের আর এক সুবিধা এই যে, জাপান আপনার ভূমিতে বসিয়া যুদ্ধের আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতেছেন, রুষিয়াকে সহস্র মাইল দূর হইতে বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। রুষ সম্রাট্ যুদ্ধের দুঃসংবাদ প্রথমে পাইয়াই আর্ত্ত স্বরে জগৎকে জানাইয়াছেন—"আমার বিশ্বাসঘাতী শত্রু অন্ধকারে আমার বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়াছে এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে আমার কেল্লা ও জাহাজ সকল বিনষ্ট করিয়াছে।" পরে তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রজা সকলকে সসজ্জ হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "আমার প্রস্তুত হইতে কিছুদিন যাইবে, কিন্তু রুষিয়ার গৌরবোপযোগী শতগুণ বৈরনির্য্যাতন করিব।" ইতিমধ্যে তিনি কোন কোন সেনাপতিকে পদচ্যুত

করিয়া তাহার স্থানে নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই যুদ্ধ বর্ত্তমান যুগের যে এক মহা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইবে এবং ইহার ফলে পৃথিবীতে বহুদিনব্যাপী অশান্তি ও অনিষ্ট হইবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা রুষিয়ার জন্য দুঃখিত যে, রুষিয়া এত বড় সমৃদ্ধিশালী হইয়া একটু লোভ-সম্বরণ ও ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। আমরা জাপানের জন্য শত দুঃখিত যে, জাপান অল্পকালমধ্যে ঈশ্বরপ্রসাদে এবং নিজ অধ্যবসায়ে এক মহাজাতিরূপে গঠিত হইয়া আসিয়ার আশা ভরসা ও নির্ভর-স্থল হইতেছিল, যুদ্ধসংঘর্ষণে বলক্ষয় করিয়া বিধাতার ইচ্ছা এবং পূর্ব্বাঞ্চল-বাসীদের আশা বুঝি পূর্ণ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য সংবাদ-পত্র সকল বলিতেছেন, "জাপান যদি পরাস্ত হয়, চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; যদি জয়ী হয়, জয়ফল অতি অল্প ভোগ করিতে পারিবে—তাহার ব্যয়ে অপর জাতিরা লাভবান্ হইবে।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই যুদ্ধের শান্তি হউক এবং জাপান আপনার উপার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি ও বল আসিয়ার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করুন্।

পালামৌর বন্যজাতি।

অদ্য "বামাবোধিনীর" পাঠক ও পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যে প্রদেশের বন্য জাতির বিবরণ আলোচনা করিতে উপনীত হইয়াছি, উহা বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছোট নাগপুর বিভাগের একটি জেলা—নাম পালামৌ। পালামৌর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত শোণ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, দক্ষিণ প্রান্তে লোহারডাগা, পূর্ব্ব প্রান্তে হাজারিবাঘ। উক্ত জেলার পরিমাণফল ৪৯৪৫ বর্গ মাইল। স্থানটী পর্ব্বতময়, এবং তথাকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। পালামৌ পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া তথায় শীত ঋতুতে শীতাধিক্য ও গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া থাকে—বৃষ্টির পরিমাণ বড়ই কম, গ্রীষ্মের উত্তাপে, অনাবৃষ্টিতে ও মৃত্তিকার সহিত অধিক পরিমাণে বালি এবং প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত থাকায় ফসল সন্তোষজনক হইতে পারে না।

শীত ঋতুতে অতিশয় শীত হেতু অধিক পরিমাণে তুষার বা পালা পতিত হওয়ায় সম্ভবতঃ স্থানটীর পালামৌ নামকরণ হইয়াছিল—কেহ কেহ অন্যরূপ কারণও নির্ণয় করিয়া থাকেন—অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমুদায় লিখিলাম না।

পালামৌ পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। পালামৌর রাজা চেরো-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। চেরোগণ আপনাদিগকে চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যজ্ঞোপবীতধারী এবং পশ্চিম-দেশীয় ক্ষত্রিয়জাতির শাখা বলিয়া গণ্য। স্বাধীন পালামৌ-রাজের বংশ-তালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা বহু পূর্ব্বে কামাউন সর্দ্দারবংশীয় ছিলেন এবং আরা জিলার ভোজপুরীদিগকে আক্রমণ করতঃ তাহাদের রাজাকে আরা হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিবাদে আরার রাজসিংহাসন অধি-কারের পর কোন এক বলশালী জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিতাড়িত হন; এবং ২৫০ বৎসর পরে পুনরায় পালামৌ আক্রমণ করেন। পালামৌরাজ সিরগুজা-নামক অরণ্যে পালাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় এই চেরো-সম্প্রদায় পালামৌতে আসিয়া বাস ও রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। চেরো-সম্প্রদায়ভুক্ত এই পালামৌরাজের অধীনে ১০।১২ হাজার সৈন্য ছিল। অদ্যাপিও পালামৌর হেড কোয়াটার ডাল্টনগঞ্জের পার্শ্বে প্রবাহিত কোয়েল নদীর অপর পার্শ্বে ভগ্নরাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদ হইতে ১০ ক্রোশ ব্যবধানে গভীর অরণ্যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। দুর্গটী এক্ষণে হিংস্রজন্তুর বাসস্থান হইয়াছে।

পালামৌর বর্ত্তমান রাজা হেড্ কোয়াটার হইতে ৪ মাইল দূরে চৈনপুরে থাকেন। তিনি পালামৌ স্বাধীনরাজবংশীয় নহেন। শুনা যায়, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ কেহ, উক্ত স্বাধীন রাজার দেওয়ান ছিলেন। রাজা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ দুই একটী গ্রাম ও কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় জমি ও গ্রাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি একটী জমিদারশ্রেণীভুক্ত হন। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পালামৌ ইংরাজাধিকার-ভুক্ত হইলে সেই দেওয়ান, পরে জমিদার বংশীয় চৈনপুরাধিপতি প্রথমে রায় বাহাদুর, পরে রায় সাহেব, ও এক্ষণে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। চেরো-সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিপতি সাহাবাদনিবাসী, জাতিতে রাজপুত, নাম রাজা ভগবৎ দয়াল সিংহ। পালামৌ ইংরাজাধিকারে আসিলে ইহাকে সব-ডিবিজন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে, ১লা জানুয়ারিতে মাজিষ্ট্রেট ডাল্টন সাহেব আসিয়া আদিমবাসী-দিগকে সম্পূর্ণ বর্ব্বরাবস্থায় প্রাপ্ত হন। নরনারী সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায়, কেহ কেহ বৃক্ষাদির ত্বক্ পরিধান করতঃ লজ্জা নিবারণ করিতেছিল। তিনি অনেক চেষ্টায় ইহাদিগকে সভ্য করিয়া যান।

তখন ইহার নাম ডাল্টনগঞ্জ হয় ও ইহা তৃতীয় শ্রেণীর জেলায় পরিণত হয়। হইা একজন ডিপুটী কমিশনর (Deputy

(Comissioner) দ্বারা শাসিত। পূর্ব্বে ডালটনগঞ্জ ঘোর অরণ্যপূর্ণ ছিল। জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইবার পর সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের আবির্ভাব হইল। তখনও প্রায় সর্ব্বত্রই হিংস্রজন্তু প্রভৃতি বিচরণ করিত। রাত্রিকালে গৃহপ্রাঙ্গণে বিড়াল, কুকুরের ন্যায় তাহাদিগকে বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে দেখা যাইত। কেহ রাত্রিতে গৃহ হইতে বাহির হইতে সাহসী হইতেন না। সন্ধ্যা হইবামাত্র সকলেই গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গৃহে আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতেন। আত্মরক্ষার্থে সকলকেই বন্দুক রাখিতে হইত। অদ্যাপিও গ্রীষ্মাধিক্য হইলে সময় সময় নগরপ্রান্তে চিতা, নেকড়ে, ও ভল্লূক ইত্যাদি দেখা দেয়। অত্রত্য প্রাচীন জনৈক উকীল (যিনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথমে এ স্থানে পদার্পণ করেন) বিস্তর জায়গা জমি করিয়াছেন। তিনি গৃহ প্রস্তত করিয়াছেন, ও বহুকাল হইতে আছেন বলিয়া একপ্রকার এদেশীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া এক রয়েল টাইগার বধ করতঃ তাহার একটী শাবক লইয়া আইসেন। প্রথমতঃ শাবকটীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, পরে বড় হইয়া হিংস্রস্বভাব প্রাপ্ত হইলে উহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেন। তখন রেল-গাড়ীর সুবিধা ছিল না বলিয়া বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে গো-শকটে করিয়া উহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন। হাওড়া ষ্টেশনে আসিবামাত্র অনেকগুলি সাহেব একত্র হইয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি উক্ত সাহেবদিগের মধ্যে একজনের নিকট ৩৫০৲ টাকা লইয়া বিক্রয় করেন, আজকাল আর রয়েল টাইগার বড় দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

সুখের জীবন।*

(১)

ধন্য তার জন্ম কর্ম্ম শিক্ষা দীক্ষা আর,
যে নহে কখনো অপরের ইচ্ছাধীন;
সাধু চিন্তা দৃঢ় বর্ম্মে আঁটা হৃদি যার,
সরল সত্যের সেবা করে নিশি দিন।

(২)

যে নহে কখনো তার রিপুদের দাস,
আত্মা যার মৃত্যু তরে প্রস্তুত সতত,
বাঁধে না যাহার চিত্ত সংসারের পাশ—
লোকের প্রশংসা নিন্দা যার পদানত।

* Translated from "The Happy Life".

(৩)

আকস্মিক ঘটনায় যদি কোন জন
বাড়ে কিম্বা পাপাচারে, হিংসে না তাহায়।
তোষামোদ-তীব্রাঘাত সহে না কখন,
বুঝে না রাজ্যের বিধি—বুঝে সত্য ন্যায়।

(৪)

যে যা বলে তাতে নাহি ভ্রূক্ষেপ যাহার,
বিবেক যাহার দৃঢ় আশ্রয়ের স্থান,
স্তাবক যাহার বিত্তে নহে অংশিদার,
ধ্বংসে যার ঘটে নাক অনর্থ মহান্।

(৫)

প্রাতঃ সন্ধ্যা ঈশ্বরের যে করে ভজন,
সংসারের লোভে নয়—তাঁর কৃপা আশে,
নির্দ্দোষ দিবস যেই করয়ে যাপন
ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা সাধুবন্ধু সহবাসে।

(৬)

সে নীচ দলের লোক নন তিনি কভু,
আশায় উত্থিত—ভয়ে পতিত আবার,
নাহি ভূমি, তথাপিও আপনার প্রভু,
কিছু নাই তথাপি সকলি আছে তাঁর।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪৮৪ সংখ্যা ২৫০ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধ, সিদ্ধি, সিদ্ধিদ, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিবিধাতা, সিদ্ধেশ্বর, সিধা, সীমা, সীমাতীত, সীমান্ত, সু, সুকৃৎ, সুকৃৎ-বন্ধু, সুকৃতিবিধাতা, সুখ, সুখকর, সুখকারী, সুখদ, সুখদাতা, সুখময়, সুখাকর, সুখাধার, সুখাবহ, সুখালয়, সুখস্বরূপ, সুখী, সুখে দুঃখে সমবন্ধু, সুগতিবিধাতা, সুচতুর, সুচরিত, সুচিন্ত্য, সুচারু, সুচেতা, সুজন, সুজনবন্ধু, সুতীক্ষ্ণদর্শী, সুদীনসখা, সুদুর্লভ, সুধাধার, সুধাময়, সুধাসিন্ধু, সুধী, সুধীর, সুধীন্দ্র, সুনন্দ, সুনামা, সুনীতিগুরু, সুন্দর, সুন্দরতম, সুপণ্ডিত, সুপর্ণ, সুপ্তপরিদর্শক, সুপ্তিহীন, সুফলদাতা, সুবল, সুভদ্র, সুমতি-দাতা, সুমধুর, সুমনা, সুর, সুরনন্দন, সুরপতি, সুলভ, সুললিতরূপ, সুলক্ষ্য, সুশাসক সুশোভন, সুষুপ্তবন্ধু, সুহৃদ্, সুহৃত্তম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাত্সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মশক্তি, সূক্ষ্মদর্শী, সূরী, সূরীন্দ্র, সৃজনকর্ত্তা, সৃজনলয়কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টিধর, সৃষ্টিরক্ষক, সৃষ্টিপালক, সেই সত্য, সেরা, সেবক, সেবক-বৎসল, সেবনীয়, সেব্য, সোমেন্দ্র, সৌজন্যগুরু, সৌভাগ্যদাতা, সৌভ্রাত্রবর্দ্ধক, সৌম্য।

নূতন সংবাদ।

১। ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ ১৩ই ফেব্রুয়ারী সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার

ভিত্তিস্থাপন এবং তাঁহার পত্নী পারিতোষিক বিতরণ করেন। অপার-সার্কুলার রোডে "কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জন্স" বিদ্যালয়ের বাটী শুদ্ধ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড বিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। কুমারী কার্পেন্টারের স্মরণার্থ তথায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ হল হইবে। গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

২। ছোটলাট শ্যামবাজারে অনাথাশ্রমেরও গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কুমার মন্মথ নাথ মিত্র ইহার জন্য একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কতক জমি আবার ক্রয় করাইয়া দিবেন।

৩। বড়লাট কুর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন "বিশ্ববিদ্যালয়াবলী আইন দ্বারা উচ্চ শিক্ষার বলিদান করিবেন না, কিন্তু সুনিপুণ ডাক্তারের ন্যায় ইহার রোগ সকল নিষ্কাসিত করিয়া ইহাকে চিরজীবিনী করিবেন। "ফলেন পরিচীয়তে।"

৪। বড়লাট চট্টগ্রাম ঢাকা ও ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার যুক্তি সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

৫। গত ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে বালিকা-বিদ্যালয় সকলের ইন্স্পেক্ট্রেস শ্রীমতী এ সি মেরী মুরাটের উদ্যোগে সূচি-শিল্প-প্রদর্শনী সভা হইয়াছিল। ছোটলাট-পত্নী উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সুন্দর সূচিকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি স্বর্ণ রৌপ্য পদক বিতরিত হইয়াছে।

৬। পুটিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারী রাজসাহী কলেজে বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়নার্থ একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং অধ্যাপনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বার্ষিক ১৬০০ টাকা দিবেন। ৫ টাকার ছাত্রবৃত্তি কয়েকটীও প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৭। ভূপালের বেগম মদিনায় গিয়া অত্যাচারী আরবদের হস্তে বিপন্ন হইয়াছিলেন, মক্কায় সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

৮। ১৮৭৬ সালে নেটালে ভারতবাসীর সংখ্যা ১০,৬২৬ ছিল, ১৯০২ সালে ৭৮,০০৪ হয়, এক্ষণে আরও বাড়িয়াছে।

৯। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে রুষ জাপানে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। প্রথম দুই জলযুদ্ধে জাপানীরা জয়ী হইয়াছেন, এবং শুনা যায় রুষিয়ার নৌবল অর্দ্ধেক খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। রুষিয়া কোন কোন স্থলে জাপানীদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। জাপান সম্পূর্ণ প্রস্তুত, রুষিয়া এখনও অপ্রস্তুত। উভয় পক্ষের বলাবল এইরূপ প্রকাশিত—

রুষ	জাপান
স্থলসৈন্য ৪৫ লক্ষ	৬ লক্ষ
তোপকামান ৫০০০	৭০০
রণতরী ৬১	৫০
নৌসৈন্য ৯৪০০০	৬০০০০

১০। প্রেসিডেন্সী জেল—যাহাকে হরিণবাড়ী বলে, তাহার উত্তরে "বিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির" নির্ম্মাণার্থ স্থান ঘেরাও হইয়াছে। জেলখানা উঠিয়া গিয়া একটী উদ্যান হইবে। স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে ৭।৮ বৎসর যাইবে, কিন্তু তথায় যে সকল দ্রব্য রক্ষিত হইবে, ইতিমধ্যে তাহার প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে।

১১। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে নূতন পার্লেমেন্ট্ খুলিয়াছে।

১২। কাবুলের আমীর হবিবুল্লার সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সর্দ্দার উমাউল্লাজানের ঘোরতর মনোবাদ হইয়াছে, ইহাতে একটী শোচনীয় বিগ্রহঘটনার সম্ভাবনা।

১৩। লর্ড কর্জন চট্টগ্রামে গিয়া আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে খুলিয়াছেন।

১৪। আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বঙ্গমাতার অশেষ-গুণভূষিত সুপুত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গত ২৩এ ফেব্রুয়ারি মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে, ৭১ বৎসর বয়সে, কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বাগ্মিতা, কি লিপিপটুতা, কি বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধান, কি দেশহিতৈষিতা, কি ধর্ম্মবিশ্বাস, একাধারে সকল গুণের আধার ছিলেন। ইঁহার অভাবে সমগ্র ভারত মহাক্ষতিগ্রস্ত! এ অভাব শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কর্ম্মফল — শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। একটী বালককে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা, মাসী ও মেসো বাবুয়ানা ও সাহেবিয়ানা শিক্ষা দিয়া তাহাকে বিগড়াইয়া দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা হয়। গল্পটী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

২। সচিত্র কবিতা-কোরক—শ্রীরমেশ-চন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক ১৪টী কবিতা আছে। লেখকের শক্তি আছে, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।

৩। নব শিক্ষা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠ্য —শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৵০ আনা। গদ্যে ও পদ্যে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে এবং ইহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার পাঠ আছে। পুস্তক-খানি বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্র গৃহীত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হই।

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—মূল্য ২৲। পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

নীরব।

নীরব হইতে বড় হয়েছে বাসনা,
নীরবে সাধিব আমি সকল সাধনা।
নীরবে করিব সদা হরিগুণ গান,
নীরবে করিব হৃদে হরিরূপ ধ্যান।
সংসারের যত কিছু দুঃখ আর ভয়,
নীরবে সহিয়া যেন করি সব জয়।
জীবনের কাজ সব নীরবে বুঝিব,
প্রাণ দিয়ে সদা তাহা নীরবে সাধিব।
যখন আসিবে দেব তব আবাহন,
নীরবে তোমার কাছে করিব গমন।
অতি ভয়ঙ্কর সেই মৃত্যুর যাতনা,
তুমি থাক প্রাণে, আর রবেনা ভাবনা।
তব পদে নিবেদন ওহে দয়াময়!
নীরবে আমার যেন সব শেষ হয়!

শ্রীসুমতি মজুমদার, বাঁকিপুর।

বিদায়ী পূর্ণিমা।

এই হেমন্তের শশী,
এই পূর্ণিমার নিশি,
রজত জ্যোছনা মাখা,
আছিল ধরায়।
এই দিনে এইখানে,
শেষ দেখা তার সনে,
এমনি সময়ে সে যে
নিয়েছে বিদায়।
বলিতে গো বুক ফাটে,
তিন বর্ষ প্রায় কাটে,
সকলি আসিল ফিরে,
সে গেল কোথায়?
হেমন্ত আসিল ঘুরে,
পূর্ণিমা আসিল ফিরে,
মাস, বর্ষ, বার তিথি
ফিরিল ত্বরায়।
সে কি আর আসিবে না?
আর ফিরে চাহিবে না?
জনমের মত ফেলে
গেল খেলাঘর!
সেই বিদায়ের রাতি,
হেমন্ত পূর্ণিমা তিথি,
হৃদয়ে রহিবে গাঁথা,
যুগ যুগান্তর!

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

যায় দেবী যায়॥*

যায় দেবী যায়,
পাপ ধরা পরিহরি,
স্বর্গপথ আলো করি,
শূন্যে ফুটাইয়া ফুল সৌন্দর্য্য ছটায়।
ওই দেবী যায়। ১
যায় দেবী যায়,

---

* রংপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস।

স্বর্গ সুরবালাগণ,
করি নব আয়োজন,
খেলিতে নূতন খেলা ডাকিছে তাঁহায়,
ওই দেবী যায়। ২
-যায় দেবী যায়.
স্বর্গে আছে সতী কুঞ্জ,
প্রেম প্রীতি পুঞ্জ পুঞ্জ,
তাহে শোভে ক্ষমা, ধৃতি অপূর্ব্ব শোভায়,
ওই দেবী যায়। ৩
যায় দেবী যায়,
মুদিত নয়ন-পত্র,
মলিন মুখ পবিত্র,
ধূলায় লুটায় কায় হায় হায় হায়,
ওই দেবী যায়। ৪
ওই দেবী যায়,
অন্তঃসত্ত্বা সতী নারী পুত্র পৌত্র কোলে করি
শিয়রে দেবতা স্বামী তুলসীতলায়,
ওই দেবী যায়। ৫
ওই দেবী যায়,
সীমন্তে সিন্দুর দাগ, চরণে অলক্ত রাগ,
পিধানে নূতন সাড়ী, কৃষ্ণ নাম গায়,
ওই দেবী যায়!
যে নারী সধবা মরে, সপ্ত স্বর্গে স্বর্ণঘরে
তার স্থান, দেবপুরে পুণ্যের মেলায়,
ওই দেবী যায়। ৭
যায় দেবী যায়,
পতি পুত্র থুয়ে সতী, চলিল অমরাবতী,
মোরা কবে স্থান পাব সে পদছায়ায়,
ওই দেবী যায়।৮

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাসী।

স্মৃতি।

কি গভীর বেদনায়,
হৃদয় দহিছে হায়!
প্রকাশে নীরব ভাষা,
যেন প্রাণে কি পিপাসা।
অব্যক্ত সে ভাব গূঢ়,
কল্পনিতে হই মূঢ়।
যেন কারে প্রাণ চায়,
খুজিয়াও নাহি পায়।
পাই পাই তারে ধরি,
ধরিতে পড়িছে সরি।
প্রাণে প্রাণে দেখা হয়,
আবেশে বিহ্বলময়।
আনন্দে শিহরে প্রাণ,
সচকিতে হয় আন।
চির-পরিচিত সেই,
কিছুতেই ভুল নেই।
সেই প্রীতি প্রাণচোরা,
সে প্রেমে চিত্ত বিভোরা।
সে প্রিয় না হবে যদি,
দাস্য সখ্য মধুরাদি,
পঞ্চ ভাবে কেন প্রাণ,
স্ফুরিছে ধরিছে তান।
মোহন মাধুরী সেই,
এই সেই ওই এই।
স্বরগে মরতে দেখা,
দিতেছ, দিওহে সখা!

জীবনে মরণে হাত,
ধরে থেক সাথে সাথ।
যদি পুনঃ জন্ম লই,
জন্মি যেন নারী হই।
পুনঃ সে পাইয়া পথে!
ঘুচাইব মনোদুঃখে!
না হয় জনম যদি,
যথা তথা নিরবধি,
মুক্তি বা স্বর্গের পথে
থেক সথে সাথে সাথে॥

শ্রীঅম্বিকা সেন।

ব্যর্থ আশা।

সারা জীবন ব্যথ আশায়
নীরব ভাষায় কাটিয়া গেল।
হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া নীরবে
নীরবে বহিল আঁখির জল।
উষায় যখন মেলিনু নয়ন
আধ ঘুম ঘোরে আধেক জাগি,
তখনি চাহিতে করেছিনু ভুল
জানিনাক কোন্ সুখের লাগি।
তার পরে ধীরে প্রভাত হইল,
তীব্র রবি-করে জাগিনু যবে।
সুপ্ত আঁখি মেলি চাহিয়া বুঝিনু,
সেই স্মৃতিটুকু ভুলিতে হবে।
প্রস্ফুন মুকুল নীহারজড়িত
ছিল ভুলে বটে তরুর গায়।
অরুণকিরণে,—প্রেমসিক্ত মুখ
মুছাইতে হবে, ধরার দায়।
সেই অভিজ্ঞতা, মুকুলিত প্রাণে
বাজাইল কত করুণ বাঁশি,
নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিনু
নীলিমার মাঝে হাসিছে শশী।
বিহ্বলকারী মৃদুল জ্যোৎস্না
স্নিগ্ধ পরশে আবরি রেখেছে,
ছিন্ন মুকুল কুড়াইয়া লয়ে
জড়াল আদরে হৃদয় গেহে।
শুকাইয়াছিনু, শুকাইতেছিনু,
পথে পড়েছিনু ধূলির মাঝে,
সারাটী জীবন লুটাতাম বনে
নীরবে কাঁদিয়া মলিন সাজে।
করুণা-ধারায় কাতরহৃদয়
ধুইয়া আদরে টেনেছে কোলে।
ভুল-নিমগন হৃদয় আমার
তবু ভ'রে থাকে আঁখির জলে।
দেবের প্রসাদ—চির-আকাঙ্ক্ষিত
সে আশা আমার অনেক দূরে।
নিয়তি-বেদনে, মরতমাঝারে
বাজে কি বাজনা বেদন সুরে।
কতদূর আর জীবনের পথ,
কোথায় তাহার হইবে শেষ?
কোথায় আমার চির-ঈপ্সিত,
সুখ-সাধনার অমিয় দেশ?
এস চির-বাঞ্ছিত চির-আরাধ্য!
নিবাও প্রাণের সকল জ্বালা,
কর মুকত জীবন, খুলে দাও ফাঁস,
পরিত্যক্ত এ মলিন মালা॥

শ্রীসরসী দাসী।

করুণা সুন্দরী।

(কোনও বান্ধবকন্যার জন্মদিনে)

আয় আয় আয়,
ভরিয়া রেখেছি বুক প্রীতিমমতায়।
না আসিতে ধরাধামে আগেই তোমার নামে
আমরা গেঁথেছি মালা বেলা যূথিকায়;
তোমারি তোমারি তরে চে'য়ে আছি সকাতরে,
কাতরা চাতকী সম দূর নীলিমায়।
আশার মন্দির গড়ি কতই যতন করি
স্নেহের তোরণদ্বার বাঁধিয়াছি তায়;
উন্মুক্ত করি সে দ্বার, কর প্রাণ অধিকার,
আয়রে! সোণার যাদু ধরাধামে আয়।১

আয় আয় আয়
আদরে রাখিব তোরে ফুল বিছানায়;
মা রেখেছে সযতনে অমৃত পুরিয়া স্তনে,
দেববালিকার মত পিয়া'তে তোমায়;
বুকের উপরে তব গড়িবে কুটীর নব,
লাগিবে না কাদা ধূলা ও কোমল গায়।
যা আছে সকলি দিব, কোলে নিব কাঁথে নিব,
অবিরাম মহোৎসবে রহিবে হেথায়।
সুখে থাকি দুখে থাকি চাঁদমুখে রাখি আঁখি,
জুড়াব তাপিত প্রাণ তব করুণায়;
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়।২

আয় আয় আয়,
বহা'তে অমৃতগঙ্গা পাষাণ হিয়ায়;
আয়রে করুণারাণী প্রেমের প্রতিমাখানি
জুড়াইতে মরুভূমি করুণা-ছায়ায়।
দেখ, ধূমকেতু সম ছুটিছে জীবন মম
এ মহা অনন্ত মাঝে কেন্দ্রহীন প্রায়।
এস তুমি মধ্যবিন্দু প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
বেড়াইব চারি দিকে ঘিরিয়া তোমায়।
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়!৩

আয় আয় আয়!
নন্দন সুরভি মাখি সুকোমল গায়,
স্বর্গের সংবাদ দিতে আয় যাদু পৃথিবীতে,
লিখিতে জীবনগ্রন্থে নবীন অধ্যায়।
শিখাতে নিষ্কাম ধর্ম্ম, শিখাতে প্রেমের মর্ম্ম,
আপনা সঁপিয়া দিতে অপরের পায়!
যতই থাকি না কাজে, জাগিবে হৃদয়মাঝে
সতত তোমার কথা বিভুপ্রেম প্রায়,
আয়রে করুণারাণি! ধরাধামে আয়।৪

আয় আয় আয়!
হাসিমুখে হাসাইতে আমা সবাকায়।
আছি মোরা পথ চেয়ে, আয়রে সোণার মেয়ে,
"করুণা সুন্দরী" নামে ডাকিব তোমায়।
চির-কৃপাময়ী সাজে সাজিও সংসারমাঝে,
যাচি এ করুণা ভিক্ষা বিধাতার পায়।
হ'য়ে চির-গুণবতী, হও তুমি আয়ুষ্মতী,
তিন কুল হোক আলো তোমার প্রভায়।
আয়রে! সোণার মেয়ে, ধরাধামে আয়।৫

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 487-88. March & April, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ।	ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০।	৭ম কল্প।
৪৮৭-৮৮ সংখ্যা।		৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির—গত ৩রা মার্চ্চ বিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সূচনা উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মিউসিয়ম বাটীতে এক উৎসব হয়, তাহাতে স্থপতি সার উইলিয়ম এমার্সন বাটীর নক্সা প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনও সময়োচিত বক্তৃতা করেন। বাটীটী ব্রিটিষ শাসনের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি হইবে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে ৮ বৎসর এবং অন্যূন কোটি টাকা লাগিবে।

প্রদর্শনী—উক্ত স্মৃতিমন্দিরে যে সকল জিনিষ রাখিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। প্রদর্শনী কিছু কাল চলিবে।

তিলকের খালাস—গত ৩রা মার্চ্চ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র গঙ্গাধর তিলক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী এ সংবাদে আনন্দিত।

পুসা কৃষিকলেজ—গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বঙ্গের ছোট লাট স্থানাদি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভারতের কৃষির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্ট চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। বর্ণার্ড কভেণ্ট্রি সাহেব এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরিদর্শিকা—বিবী লিলিয়ান ব্রুক ভারতীয় শিক্ষার শ্রেণীস্থ হইয়া বঙ্গদেশের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস হইলেন। গবর্ণমেণ্ট

বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অধিক টাকা দিবেন এবং পরিদর্শিকার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন, ইহা বড় আশার কথা।

রুষ-জাপ যুদ্ধ—মার্চ্চ মাস হইতে জাপানীরা আবার অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা কোরিয়ার রাজধানী সিওল হস্তগত করিয়াছেন, পিংইয়াম নগর অধিকার করিয়া তথায় বহুসৈন্য সমাবেশ করিতেছেন এবং পোর্ট আর্থর বন্দর ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া রুসদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। রুসেরাও অসমসাহসে যুঝিতেছেন, কিন্তু এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

প্রধান সেনাপতি—ভূতপূর্ব্ব ভারতের প্রধান সেনাপতি সার পাউয়ার পামরের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জঙ্গী-লাট লর্ড কিচেনার সুস্থ হইয়া ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছেন।

নূতন আইন—গত ৪ঠা মার্চ্চ "অফিসিয়াল সিক্রেটস্ আক্ট" অর্থাৎ আফিসের গুপ্ত কথা প্রচারের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা দ্বারা সংবাদ পত্র সকল শঙ্কাকুল হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়াবলী-বিধিও ব্যবস্থাপিত হইল। বঙ্গবিভাগ ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ব্যবস্থা এখনও বিবেচনাধীন।

টাউন হলে বিরাট সভা—বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদার্থ গত ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, সভাপতিত্ব এবং অনেক বিজ্ঞ লোক বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্মৃতি-মেডাল—(১) ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরী কলেজের অধ্যাপক বাবু সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০০ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে "উমেশচন্দ্র মুখর্জি মেডাল" নামে মেডাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় স্ত্রীলোককে প্রদত্ত হইবে।

(২) স্বর্গীয় বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ তাঁহার পুত্র বাবু সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১০০০ টাকা দিয়াছেন, ইহা হইতে স্মৃতি মেডাল প্রদত্ত হইবে।

বেতন বৃদ্ধি—সিংহলের গবর্ণর বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা পাইতেন, এক্ষণ হইতে ৯৬ হাজার টাকা পাইবেন।

হিন্দুসংখ্যা হ্রাস—গত সেন্সসের গণনায় হিন্দুসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ৫০ লক্ষ কমিয়াছে। ৬ লক্ষ হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে, আরও অধিক মুসলমান হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে অনেকে মরিয়াছে। হিন্দু জাতির যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে সুসংস্কৃত না হইলে আর উন্নতির আশা নাই।

আমেরিকা যাত্রী ছাত্র—বিক্রমপুরের সুধীন্দ্র বসু কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য শিখিতেছিলেন। ওয়াসিংটন গালডেট কলেজের অধ্যক্ষ বিনা বেতন ও বোর্ডিং ব্যয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হওয়াতে গত ৮ই

মার্চ্চ তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। মূকবধির-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ যামিনী বাবু ঐ বিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা লইয়া আইসেন।

জাপানের জন্য চাঁদা—যুদ্ধ-হত জাপানীদিগের বিধবা ও অনাথ সন্তানদিগের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। বোম্বাইয়ের জাপানী রেসিডেন্ট সোসাইটী ইতিমধ্যে ৩০,৮৮৩।৵ চাঁদা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার সরকার স্মৃতি-সভা—বঙ্গদেশের নানা স্থানে এইরূপ সভা হইতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে যে সভা হয়, তাহাতে সহরের অনেক গণ্য মান্য লোক মিলিত হন। রেবরেণ্ড ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর প্রভৃতি প্রস্তাবক হইয়া বক্তৃতা করেন।

সূর্য্যগ্রহণ—গত ১৫ই মার্চ্চ যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, বেলা ১০টা হইতে প্রায় ১॥ পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি দেখা গিয়াছিল। অর্দ্ধগ্রাস হইয়াছিল।

কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ।

সম্প্রতি জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে যে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহার নিমিত্ত কারণ কোরিয়া। এই যুদ্ধের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে কোরিয়ার ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। জাপানের ভূতপূর্ব্ব বৃটিষ কন্সল জে এইচ লংফোর্ড "নাইণ্টিনথ সেনচুরি" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

অতি প্রাচীন কালের জনশ্রুতি এই যে, জাপান বার বার কোরিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করে এবং কোরিয়ার রাজা জাপানের অধীনতা স্বীকার করেন। তৎপরে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হীদেযীষ জাপানের উপর একাধিপত্য স্থাপন করেন, তখন তিনি কোরিয়ার এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত ধ্বংস করেন। এ সময় চীনেরা কোরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী জাপানকেই বরণ করে। এই সময় হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত কোরিয়া নিয়মিতরূপে জাপানকে কর প্রেরণ করিত, অথচ চীন সম্রাটের আনুগত্যও স্বীকার করিত। ১৮৭১ সালে কোরিয়া বিদ্রোহী হইয়া জাপানকে কর-প্রদানে অস্বীকৃত হয় এবং চীন জাপানকে সভ্যতা-ত্যাগী ও বিজাতীয় আচারব্যবহারাবলম্বী বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এ সময় জাপান অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরিক

রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহার ধনাগার শূন্য হইয়াছিল। তাহার সামরিক বিভাগ নূতন ভাবে গঠিত হইতেছিল। এ জন্য জাপান রাজ্যনাশ ও অপমান সকলই সহ্য করিয়া গেলেন—মনে মনে সংকল্প রহিল ভবিষ্যতে ইহার প্রতিশোধ লইবেন। ১৮৭৫ সালে কোরিয়ানেরা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। একখানি জাপানি (গণ বোট) নৌকা তাহাদিগের কেল্লার ধার দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিল।

জাপানিরা আর সহ্য করিতে পারিল না, জাতীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া এক বৃহৎ যুদ্ধযাত্রা করিল। কোরিয়ানেরা ভয় পাইয়া বিনাযুদ্ধে সন্ধিস্থাপন করিল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে জাপানি প্রজাদিগের বাস ও বাণিজ্যের জন্য কোরিয়া দুইটি বন্দর ছাড়িয়া দিল। ইউরোপীয় জাতি সকল সুযোগ পাইয়া বাণিজ্যের অধিকার চাহিল। অবশেষে কোরিয়া সমগ্র পৃথিবীর অবাধ বাণিজ্যস্থান হইল। জাপানের প্রতি কোরিয়ানদের বিদ্বেষভাব ঘুচিল না। সিওল নগরে জাপানিদের যে ছাউনি ছিল, তাহারা তাহা পোড়াইয়া দিল। জাপানি মন্ত্রী সদল বহুকষ্টে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে পলায়ন করিলেন। এক বৃটিষ রণতরী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইল। জাপান সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া সিওল নগরে ছাউনি স্থাপিত করিলেন। ১৮৮১ সালে চীনও এইরূপ অধিকার পাইয়া জাপানিদিগের ব্যবস্থার সমর্থন করিলেন। পরবর্ত্তী ৯ বৎসর কোরিয়াতে নানাপ্রকার গোলযোগ হয়। এই গোলযোগ নিবারণার্থ চীনমন্ত্রী লিহংচং বৃহৎ একদল সৈন্য পাঠান। জাপানিরাও সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন। জাপানিরা রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন এবং শাসনপ্রণালী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কোরিয়ার উপর চীনের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিলেন। চীন-জাপান যুদ্ধ ইহারই অব্যবহিত ফল। জাপানিরা জল ও স্থল যুদ্ধে চীনকে পরাস্ত করিয়া সন্ধি-গ্রহণে বাধ্য করেন। এই সন্ধির একটী নিয়ম এই যে, চীনেরা কোরিয়ার উপর কোনও দাবী দাওয়া রাখিবে না। কোরিয়ার রাজা ও রাণী নামে রাজা, জাপানি প্রভুদিগের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের মনোবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। জাপানি সৈন্যদিগের উত্তেজনায় একটী শোচনীয় বিদ্রোহ ঘটিল। বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাণী ও তাঁহার কতকগুলি আত্মীয়কে হত্যা করিল। রাজা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া রুসিয়া ছাউনির আশ্রয় লইলেন। রুসিয়া তখন কোরিয়া হইতে বহুদূরে ছিল; চীনের পতনে মেনচুরিয়া অধিকারের আশায় রাজাকে অভয়দান করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। রাজা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য রুসিয়াকে কোরিয়ার রক্ষকরূপে বরণ করিলেন। জাপান মনে মনে বিরক্ত হইয়া স্তম্ভিতভাবে উপস্থিত

ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। পরে রুসিয়ার সহিত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইবার সন্ধি বন্ধন করিলেন। ১৮৯৬ সালের সন্ধিতে স্থির হয় যে, যে পর্য্যন্ত কোরিয়াতে শান্তি স্থাপিত না হয়, রুসিয়া ও জাপান আপনাপন কুঠি (Settlement) রক্ষার্থ সিওল ও প্রধান প্রধান দুই বন্দরে আটশত করিয়া সৈন্য রাখিতে পারিবেন এবং তদ্ব্যতীত জাপান চিন-সংগ্রামকালে প্রস্তুত আপনার টেলিগ্রাফ লাইন রক্ষার্থ দুইশত পুলিস সৈন্য রাখিতে পারিবেন। এ সময় রুসির প্রজা ও কুঠি কোরিয়াতে ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু জাপানের ২৩ হাজার প্রজা ছিল এবং ইহার বিদেশীয় বাণিজ্যের বারো আনা তাহারই হস্তে। ১৮৯৮ সালের সন্ধিতে উভয়েই কোরিয়াকে স্বাধীন রাখিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। রুসিয়া আরো স্বীকার করেন যে, জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন না। ১৮৯৬ সালে রুসিয়া মেনচুরিয়ার সীমায় কোরিয়ার পার্শ্বে কাষ্ঠ কাটিবার অধিকার পান। সেই সূত্র ধরিয়া রুসিয়া ইয়ালো নদীর উপত্যকা অধিকার করেন এবং কোরিয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া রাস্তা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ এবং রুসিয়ার কার্য্যের সহায়তার জন্য ভূমি গ্রহণ বা অন্য যে কোন উপায় আবশ্যক তাহা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ইয়ালু নদীর মুখের নিকট একটী রুসির কেল্লা ও তাহাতে কামান-শালা স্থাপিত হইল। জাপানের ভয় হইয়াছে রুসিয়া মেনচুরিয়া গ্রাস করিয়া কোরিয়াও গ্রাস করিবেন। কোরিয়া হারাইলে জাপানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বিলুপ্ত হইবে। জাপান এইজন্য কোরিয়া হইতে রুসকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। ইহা হইতেই বর্ত্তমান রুস-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্য।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

উচ্চশ্রেণীর লোকের ভৃত্যের প্রতি পূর্ব্বভাব লোপের আর একটী কারণ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকার পারিবারিক বন্ধন এখন বড় শিথিল হইয়া গিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা এখন অনেকটা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজ আসিবার পুর্ব্বে এবং তার চেয়ে অনেক দিন আগেও ব্যবসা বা চাকরির জন্য লোকের বিদেশে যাওয়া বড় কম ছিল। দুই দশ জন লোককে অবশ্য যাইতে হইত, কিন্তু তাঁহারা মুষ্টিমেয় ছিলেন। ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা কর্ম্ম